ব্যাবিলন কথকতা

৭ম সংখ্যা

১৬ই ডিসেম্বর ২০১২

ব্যাবিলন গ্রুপ

সফ্‌টি ব্যাবিলন গ্রুপের একটি জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ। সাধারণ নারী, বিশেষ করে পোশাক শিল্পের নারী কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সফ্‌টি তৈরি করা হয়েছে। পোশাক শিল্প কর্মীদের জন্য ব্যাবিলন গ্রুপ উৎপাদন খরচের চেয়েও কম মূল্যে সফ্‌টি সরবরাহ করে থাকে।

softy

Sanitary Napkin
Regular Pack (Panty system)

softy
রেগুলার প্যাক

১০
প্যাড
(প্যান্টি সিস্টেম)

১০ প্যাড (প্যান্টি সিস্টেম)

softy রেগুলার প্যাক

softy

স্যানিটারি ন্যাপকিন
রেগুলার প্যাক (প্যান্টি সিস্টেম)

আপনার সর্বোচ্চ সুরক্ষা আর স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্চয়তায় softy

★ উন্নত মানের জীবাণুমুক্ত পাল্প প্যাডের গভীরে আর্দ্রতা ধরে রাখে, যা আপনাকে সারাদিন রাখবে শুকনো,পরিষ্কার আর সতেজ।
★ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত।
★ সর্বোপরি এটি আপনাকে দেবে সর্বোচ্চ আরাম আর হালকা অনুভূতি।

প্রস্তুতকারক:
ব্যাবিলন প্রডাক্টস্
প্লট -২৪২-২৪৩, ইউনিয়ন তেতুঁলঝোরা,
হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা।

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা

10 Pads (Panty system) Regular Pack

softy

Babylon Group: 2-B/1 Darussalam Road, Mirpur-1, Dhaka-1216, Bangladesh
Phone: 88-02-8023495-6, 8023462-3, WWW. babylongroup.com

সম্পাদক:
এমদাদুল ইসলাম

সহ-সম্পাদক:
শামীমুল ইসলাম

বিশেষ সহযোগিতা:
মাহমুদ আলম সিদ্দিকি
সালমা সুলতানা

অলংকরণ:
মাহবুবুর রহমান

প্রচ্ছদ ও শিল্প নির্দেশনা:
স্বাধীন খান

সার্বিক সহযোগিতা:
ব্যাবিলন পরিবার

মুদ্রণ:
অক্ষর প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
৮৬২২৯০১, ০১৫৫২৩৭৪৫৮৪

সূচিপত্র

শুভেচ্ছা বাণী	আনিসুজ্জামান	২
সম্পাদকীয়		৩
নিয়তি, বিধাতা ও আমি	আফজাল হোসেন	৫
তোমার জন্য ভালবাসা	শেখ আনিচুর রহমান (আনিচ)	৭
কোন এক কুসুমের গল্প	মোসাঃ হনুফা	৮
সোনার মেয়ে সেজুতি	মোঃ নুর আলম	৮
নীল জোনাকী	সংগীতা আক্তার শারমিন	৮
অপমৃত্যুর রক্ষাকবচ	প্রদীপ কুমার দত্ত	৯
ব্যাবিলন	রেবেকা বেগম	১১
শ্রমিক	মোঃ আউলাদ হোসাইন	১১
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া	আব্দুল কাদির	১২
উদ্যান অরন্য	এস. এম. আরিফ রাজ্জাক	১৩
মশা	মোসাঃ ফেরদৌসী	১৩
সোনার হরিণ কোন বনেতে থাকো?	সুলতান আহমেদ	১৪
কিছু কথা	মাহবুবুর রহমান	১৭
যার যা প্রিয়	সুলতানা খাতুন	১৮
মনের ইচ্ছা	মোঃ এনামুল হক	১৮
আকাশ ছোঁয়ার গল্প	উম্মে সালমা ডালিয়া	১৯
সফটি	নিলুফা আকতার (তিমু)	২১
তোমাকে ভালোবাসি	শওকত আলী	২৩
আজব ঢাকা	মৌমিতা	২৩
সন্ধ্যারাগে বাজে	এমদাদুল ইসলাম	২৪
আপন-পর	এ,কে,এম, গোলাম মহ্হী চৌধুরী	২৭
মা কাঁদছে	মোঃ জোবায়দুল ইসলাম	৩০
সমাজের রূপ	মোঃ কাঞ্চন মিয়া	৩১
কাকতালীয়	মোঃ আখতার হোসেন	৩২
বাংলার গান	মোঃ আলমগীর হোসেন	৩৪
অসহায়	মোঃ তারিকুল ইসলাম	৩৪
"তুমি দেখেছো কি, অগুনতি মানুষের ভীড়ে হেঁটে যাওয়া কোন এক মেয়ে..."	আব্দুল্লাহ আল রানা ফরহাদ	৩৫
লাল রঙের মেলা	মোঃ সাকিল শেখ	৩৮
তুমি শুধু সুখে থাকো	শ্রীনিবাস চন্দ্র রায় (হৃদয়)	৩৮
অবজ্ঞা	রাবেয়া খাতুন	৩৯
ব্যাবিলনের প্রতি	মোহাম্মদ মামুন হোসেন	৪২
বংশীভিটার ভুঁই	মাহমুদ আলম সিদ্দিকি	৪৩
Asia Cup Cricket - 2012.....	Mohammad Hasan	৪৬
Some of My Thoughts		
Born To Live For Ever	Salma Sultana	৪৮
ফটো অ্যালবাম	ব্যাবিলন গ্রুপের বিভিন্ন কর্মকান্ডের ছবি	৫১-৫২

ব্যাবিলন গ্রুপের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীর পারস্পরিক সম্পর্কের সাবলীলতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি

ব্যাবিলন গ্রুপের সৌজন্যে সাভারের পথে তাঁদের অফিসে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। তাঁদের অতিথিপরায়নতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। বিশেষভাবে ভালো লেগেছে কর্তৃপক্ষ ও কর্মীর পারস্পরিক সম্পর্কের সাবলীলতা দেখে। কর্মীদের জন্যে যেসব বিশেষ ব্যবস্থা তাঁরা নিয়েছেন, আমাদের দেশে তা সুলভ নয়। তাঁদের কর্মীরা সংস্কৃতিচর্চায়- যে উৎসাহ ও সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন, তাও শ্লাঘার যোগ্য। লক্ষ্য ব্যবসা, কিন্তু তার পরিমন্ডল লেনদেনের হিসেব ছাড়িয়ে এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে পেশার উর্ধ্বে প্রত্যেকের যে মানবিক সত্তা আছে তার সহজ প্রকাশ ঘটেছে। আর সংস্কৃতিচর্চার মধ্য দিয়ে শুধু আত্মবিকাশের সুযোগ ঘটে, তা নয়, নিজেকে সমৃদ্ধ করে তোলার যে-সুযোগ পাওয়া যায়, তার বিশেষ মূল্য আছে। ব্যাবিলন গ্রুপ যে-আদর্শ স্থাপন করেছে, তা আমার শ্রদ্ধা উদ্রেক করেছে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের সকলের আন্তরিক কল্যাণ কামনা করি।

শুভেচ্ছাসহ -

আনিসুজ্জামান
ইমেরিটাস প্রফেসর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকীয়

প্রিয় ব্যাবিলনিয়ান ও ব্যাবিলন শুভানুধ্যায়ী- সবাইকে জানাই মহান বিজয় মাসের শুভেচ্ছা। আর তার সাথে স্বাগত জানাই ব্যাবিলন কথকতার ৭ম সংখ্যা প্রকাশনায়। আমাদের প্রিয় বার্ষিকির চলমান সফলতার ৭ম বছরে আপনাদের সাথে আনন্দে ভাগ নিচ্ছি আমিও।

এবারের সংখ্যার পাতা পরিক্রমা সাক্ষ্য দেবে যে ব্যাবিলন কথকতা বছরে একবার প্রকাশের জন্য লেখা প্রাপ্তি এখন আর কোন সমস্যা নয়। বরং সম্পাদকের জন্য এবার সমস্যা ছিল প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রকাশযোগ্য রচনার ভীড় থেকে লেখা বাছাইয়ের। স্থান সংকটে প্রকাশযোগ্য যেসব লেখা এবার ছাপা হয়নি আশা করছি সেগুলো ৮ম সংখ্যায় যথারীতি জায়গা করে নেবে। সেসব রচনার লেখক-লেখিকার প্রতি আমার সমবেদনা রইল।

বরাবরের মতো এবারের সংখ্যায়ও নূতনদের আগমন লক্ষ্য করা যাবে-তেমনি টের পাওয়া যাবে নিয়মিত-অনিয়মিত কিছু পুরনো লেখক-লেখিকাদের অনুপস্থিতি। অসাধারণ কর্ম ব্যস্ততা!

ব্যাবিলনের সাহিত্য চর্চাঙ্গনে আরিফ রাজ্জাকের মতো কবির আত্মপ্রকাশ ব্যাবিলন কথকতার বর্তমান সংখ্যাকে কতটা সমৃদ্ধ করেছে তা কবিতাপ্রেমী মাত্র অনুধাবন করবেন। অন্য সকল নূতন লেখক-লেখিকাসহ আরিফ রাজ্জাককে অভিনন্দন ও স্বাগত জানাই কথকতায়।

গত সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন দেশের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব জনাব আনিসুজ্জামান। বর্তমান সংখ্যার জন্য তিনি পাঠিয়েছেন দারুণ উৎসাহ জাগানো একটি শুভেচ্ছা বক্তব্য। ওঁকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

বিশ্বজুড়ে ব্যাবসা-বানিজ্যে যে এক মহা অর্থনৈতিক মন্দাভাব বিরাজ করছে ২০০৮ সাল থেকে তা মোটেও মিলিয়ে যায়নি। বরং ইউরোপে সেই পরিস্থিতি আরো ঘনীভূত হয়েছে। বাংলাদেশের রপ্তানী শিল্পে স্বভাবতই এর মন্দ প্রভাব এখনো প্রকট। আর দেশের সর্ববৃহৎ শিল্প হিসেবে তৈরী পোশাক শিল্পকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে এর তীব্রতম ঝাঁজ। কাজেই ২০১২ ছিল ব্যাবিলন পরিবারের জন্য অর্জিত সাফল্য ধরে রাখার, বিপর্যয় ঠেকানোর আর নূতন রপ্তানীবাজার খুঁজে বার করা। ব্যাবসা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিলনা- তা সম্ভবও ছিলনা।

তবে এই পরিস্থিতির মধ্যেই জন্ম নিয়েছে ব্যাবিলন পরিবারে ব্যাবিলন এগ্রিসায়েন্স লিঃ। দেশের সার্বিক কৃষিখাতে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাবিলন পরিবারের পক্ষ থেকে এটা একটা ব্যতিক্রমী প্রয়াস। প্রয়াসটি সময়ের সাথে তার সার্থকতা প্রমাণ করবে এটিই আমাদের কামনা।

ব্যাবসা সুসংহত করা, সার্বিক মানোন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, সু-আচরণবিধি মেনে চলে ব্যাবসা পরিচালিত করে আদর্শ সৃষ্টি করা- এসব লক্ষ্যে উন্নততর প্রযুক্তি গ্রহণ ও কারখানায় সুযোগ বৃদ্ধির খাতে ব্যাবিলন ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে এই বছর। কর্মস্থলের পরিসর বৃদ্ধিসহ উন্নততর প্রযুক্তি গ্রহন খাতে বিনিয়োগ ব্যাবিলন পরিবারের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি প্রতিশ্রুতি পূরণে বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

ব্যাবিলন গ্রুপের একটি সার্ট প্রস্তুতকারী কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থাপনার সদস্যরা এ বছর সুযোগ পেয়েছেন উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, পণ্যমান উন্নিতকরণ ও নিশ্চিত করাসহ এসব প্রয়াসে মানব সম্পদ বিভাগের সক্রিয় ও ফলদায়ক সম্পৃক্ততা ঘটানোর

ওপর এক আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির । SOLUTIONS 4 MANAGEMENT INTERNATIONAL বা S4M*i* ঢাকার তিনটি তৈরী পোশাক প্রতিষ্ঠানকে বাছাই করেছিল এদের পাইলট প্রকল্প হিসেবে । এই তিন প্রতিষ্ঠানের একটি ছিল ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ । ছয় মাস ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ ব্যাবিলনের জন্য দারুণ লাভজনক হয়েছে । এই প্রশিক্ষণ ব্যাবিলন সার্ট ফ্যাক্টরীগুলোতে উন্নততর কর্ম-সংস্কৃতি রচনার জন্য প্রেরণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে । DFID, TESCO ও আরো কয়টি ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত S4M*i* -কে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ।

বছরের শেষ প্রান্তে এসে পোশাক শিল্পে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক ও বেদনাবিধুর শোকাবহ ঘটনা । আশুলিয়াস্থ তাজরীন গার্মেন্টস-এ অগ্নিকান্ডে নিহত শতাধিক শ্রমিকের মৃত্যু সমগ্র জাতিকে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে গেছে । জাতির আর্থিক মেরুদন্ডসম শ্রমঘন এই শিল্পটিকে জান-মালের নিরাপত্তার জন্য আমরা যে এখনো যথেষ্ট করছিনা তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর এই দুর্ঘটনাটি । আশা করব শ্রমিকদের এই জীবনদান ব্যর্থ যাবে না । অবোধদের বোধোদয় ঘটাতে আর কোন দুর্ঘটনার প্রয়োজন হবে না- এটা আমাদের দাবী ।

ব্যাবিলন কথকতার প্রিন্টার্স লাইনে আগামী সংখ্যা থেকে আপনাদের চেনা দুটো নাম আর দেখা যাবে না । এবছর ব্যাবিলন কথকতা হারিয়েছে দুজন প্রায় অপরিহার্য হয়ে ওঠা নিবেদিত প্রাণ কুশলিকে । শামীমুল ইসলাম ও সালমা সুলতানা । ব্যাবিলন কথকতা প্রকাশনা পর্ষদ এদের অসামান্য অবদান কোনদিনই ভুলতে পারবেনা । আমরা শামীম ও সালমার সফল কর্মজীবন কামনা করি ।

শামীমুল ইসলামের ব্যাবিলন থেকে অকাল প্রস্থান স্বভাবতই দারুণ সংকটে ফেলেছিল কথকতার ৭ম সংখ্যার প্রকাশনাকে । ঠিক তখন প্রায় দৈব সহায়তার আদলে মাহমুদ আলম সিদ্দিকির আবির্ভাব ঘটে কথকতা মঞ্চে । শংকা কেটে যায় সম্পাদকের । অক্লান্ত পরিশ্রম করে আর তার সবটুকু মেধা ঢেলে মাহমুদ শামীমের অভাব পূরণের প্রয়াস পেয়েছে । মাহমুদকে ধন্যবাদ । ব্যাবিলনের কমার্শিয়াল বিভাগের সাব্বির মোঃ রমি ও অক্ষর প্রিন্টার্সের কামাল সাহেবকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেই হবে তাদের স্ব স্ব ভূমিকার জন্য- যা না হলে সময়মতো পত্রিকাটি বের করা প্রায় অসম্ভব হয়ে যেতো ।

বরাবরের মত প্রচ্ছদ শিল্পী এবারও আমাদের স্বাধীন খান । তবে অলঙ্করণে এবার আমরা পেয়েছি ট্রেন্ডজ-এর আর একজন প্রতিভাবান ডিজাইনারকে । মাহবুব যত্ন ও দরদ দিয়ে অলঙ্করণের কাজগুলো করেছে । তাকে অনেক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা ।

পরিশেষে এবারের সংখ্যার সকল লেখক-লেখিকা, কলা-কুশলীসহ সকল ব্যাবিলনিয়ানকে আবারো শুভেচ্ছা- শুভেচ্ছা ইংরেজী নববর্ষ ২০১৩ -এরও । বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের দুর্যোগ কেটে যাক- বাংলাদেশ এগিয়ে যাক- এই কামনা করে শেষ করছি ।

এমদাদুল ইসলাম
সম্পাদক

ডিসেম্বর ১৫, ২০১২ইং

নিয়তি, বিধাতা ও আমি

আফজাল হোসেন
অফিসার, এইচ.আর.ডি
ব্যাবিলন আউটফিট লিমিটেড

১

ঘুম ভাঙ্গা চোখে তাকাতেই দেখি সামনে দাঁড়িয়ে বিধাতা। বিশ্বাস করতে না পেরে নিজের গায়ে চিমটি কেটে নিশ্চিত হলাম, জ্ঞানে আছি নাকি অজ্ঞানে। অজ্ঞান, ঘোরে বা স্বপ্নে নেই নিশ্চিত হয়ে তড়িঘড়ি করে উঠে খাটের উপর পা গুটিয়ে বসে অপলক নয়নে শুধু বিধাতার স্বরূপ দেখছি। বিধাতা প্রথমেই আমার মৌনতা ভঙ্গের চেষ্টা করলো চোখের উপর তার নূরের ঝলকানিতে। আমি শুধু সম্মতিসূচক মাথাটা নেড়ে হ্যাঁ বললাম।

এতক্ষণে বুঝে গেছি গতকাল তন্দ্রার দাফন শেষে রাতে ঘুমাতে যাবার আগে আসন পেতে বসে ছিলাম বিধাতার কাছে। যারপরনাই আকুতি-মিনতি করছিলাম আমার আরজিটা নিয়ে। আমার আরজিটা হয়তো যুক্তিযুক্ত ছিল বলেই বিধাতার এই উপস্থিতি। আমি অনুনয়ের সুরেই বললাম, আমাকে কি একটা দিন ফিরিয়ে দেয়া যায় বিধাতা?

- সে রকম কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া কাউকেই এরকম সুযোগ দেয়া হয়না। আমি অসহায়ের মতো প্রার্থনার দৃষ্টিতে আবারো বিধাতার পানে চাইলাম। বুঝলাম এবার বোধ হয় বিধাতা আমার আরজিটা অনুমোদন করবে।

স্পষ্ট শুনতে পেলাম বিধাতা ভারি গলায় বললো- তুই কি সিওর, এক দিন সময় পেলেই তুই তোর সব ঠিক করে নিতে পারবি? আমি আত্মবিশ্বাসি হয়ে দৃঢ়তার সাথে বললাম, হ্যাঁ বিধাতা, আমাকে ২৪ ঘন্টা সময় দিলেই আমি সব ঠিক করে নিতে পারবো বলে আশা এবং বিশ্বাস করি, আমাকে একটা সুযোগ দেয়া হোক। বিধাতা রাজি! এরকম বার্তা আকাশে বাতাসের ধ্বনিতে শুনলাম মিনিটখানেক। দু-দিন পর বড়সড় এক স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলাম আমি, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আশ্বস্ত করলাম নিজেকে।

'তন্দ্রা' আমার স্ত্রী। ও গতকাল রোড এক্সিডেন্ট করেছিল বেলা ১১টা নাগাত। সংবাদটা সাবলেট ভাবির মোবাইল ফোন মারফত জানার পর অফিস থেকে ছুটি নিয়ে দ্রুত ছুটি জাতীয় পঙ্গু হাসপাতালে (জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান)। হাসপাতালে পৌঁছে সাবলেট ভাবির মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে তন্দ্রার কেবিনে পৌঁছে গেলাম মিনিট দু-একের মধ্যে। হাসপাতালের বেডে শুয়ে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলো তন্দ্রা। ও আমার হাত ছুয়ে অঝোর নয়নে শুধু কাঁদছিল। আমি কান্না জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে হলো এটা? তন্দ্রা তখন ভাঙা ভাঙা গলায় বলছিল-

তোমার জন্যে, সব তোমার জন্যে, তুমি যদি ফস্টি-নস্টি না করতে মেয়েটার সাথে আমার কিছুই হতো না। আমি আজ মরতেও রাজি, তাছাড়া কিছুক্ষণ আগে তুমি ফোনে আমাকে যা যা বলেছো কোনভাবেই মানতে পারছিলাম না আমি। নিজেকে অনেক অসহায়, ছোট মনে হচ্ছিল, পরাজিত হবার ভয়ে প্রস্থান করে বাঁচতে চাচ্ছিলাম, তাই ঝোকের মাথায় রাগ করে---। এটুকু বলেই জ্ঞান হারায় তন্দ্রা, আমি ডাক্তার ডাক্তার বলে পাগলের মতো ছুটতে থাকি এ কেবিন থেকে ও কেবিনে, ততক্ষণে অনেকটা সময় পার হয়ে যায়, তন্দ্রার কেবিনের কর্তব্যরত ডাক্তার আমাকে বলে-আই এ্যাম সরি!

কিছু সময় আগের কথা, আমি তখন অফিসে, সকাল ১০:৩০ মিনিট হবে। অফিসের কাজে মোটামুটি ব্যস্ত, হঠাৎই তন্দ্রার ফোন-

-হ্যালো, কি, কিছু বলবে?

-তোমার সাথে একটু জরুরি কথা ছিল।
-কি কথা?
-তুমি একটু এক সাইডে যাও।
-এক সাইডেই আছি, বলো না কি কথা।
-বাসায় একটা নতুন প্যাকেট দেখলাম, প্যাকেটের গায়ে তোমাদের অফিসের লোগো, প্যাকেটের ভিতর নতুন একটা টি-শার্ট, কোথায় পেলে টি-শার্টটা, এক নিঃশ্বাসে জেদি কণ্ঠে বললো তন্দ্রা।
-ও এই কথা, এটা কোন জরুরি কথা হলো?
-হুঁহ, এটা আমার জন্যে খুব জরুরি ব্যাপার, আর টি-শার্টটা কোত্থেকে এলো সেটা জানাও আমার জন্যে খুবই জরুরি।
-টি-শার্টটা শোভার, ওর স্বামীর জন্যে----, অফিস থেকে ওদের ডিপার্টমেন্টের সবাইকে দিয়েছে, টি-শার্টটা শোভার স্বামীর শরীরে লাগবে না বলে-----
-এমনিতে নাচুনে বুড়ি তার উপর নাতিনের বিয়া, ঢেমনিটা টি-শার্টটা তোমাকে দিবে কেন শুনি?
-ভাষা সংযত করো তন্দ্রা, মাথা ঠিক আছে তোমার?
-আমার মাথা ঠিক নেই, নাকি তোমার মাথাটা চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে ডাইনিটা। ডাইনিটাকে পেলে চুলের মুঠি ধরে .. বে..ম্যা....
-দেখ তন্দ্রা, এভাবে কথা বললে আমি ফোনের লাইন কেটে দিতে বাধ্য হবো-
-ফোনের লাইন কাটো, আর যাই করো, তোমার সাথে আর এক মুহূর্ত নয়। আমি বুঝে গেছি তোমার মতো চরিত্রহীনের সাথে ঘর করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমি আজকেই চলে যাবো, আর দুদিনের মধ্যে তোমাকে ডিভোর্স লেটারটা পাঠিয়ে দিবো।
-আমার সাথে না পোষালে যেতেই পারো তুমি, সে স্বাধীনতা তোমার আছে। তাছাড়া আমিও সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমিই তোমাকে ডিভোর্স দিবো, আজকেই কথা বলে নিবো তোমার বাবা মা'র সাথে। তুমি যা খুশি তাই করো, আমার কোন আপত্তি নেই। মরতে পারো না তুমি, এতো মানুষের মরণ হয় তোমার হয়না কেন, তুমি মরলে অন্তত আমি তো বাঁচতাম। রাগের মাথায় কথাগুলো বলে আমিই ফোনের লাইন কাটি এ প্রান্ত থেকে।

শোভা আমার অফিসের মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট। শোভাকে আমার সাথে জড়িয়ে অযথাই সন্দেহ করতো তন্দ্রা। এর পিছনে কোন যুক্তিযুক্ত প্রমান ছিল না তন্দ্রার হাতে। আসলে মোবাইলে এস এম এস পাঠানো শোভার একটা মুদ্রা-দোষ। ওর ফোনে কোন বন্ধু-বান্ধবি বা কলিগ ফানি বা ভালোবাসায় পূর্ণ এস এম এস পাঠালে ও আমাকে সেটা পাঠাবে তবেই সে খুশি। সাথে সাথে অপরাধির মতো আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে ছোট্ট শিশুর মতো বলবে, স্যার কিছু মনে নেননি তো? আমি শোভার অসহায় চেহারার কাছে কখনোই বলতে পারিনি তুমি আমাকে আর কখনো এস এম এস পাঠাবে না শোভা। শোভা ওর স্বামীর দুর্ব্যবহার আর নির্যাতনের কথাগুলো বলতো আমাকে। ওর অসহায় মুখটার কাছে আমি হেরে যেতাম আমার বিধবা বোন তুলির কথা ভেবে। তুলি আমার আপন ছোট বোন। ও বিধবা হয়েছে গতবছর, মাত্র ২০ বছর বয়সে।

২

আজ ১২:০১ টায় (এ.এম) আমার আবেদিত তন্দ্রাকে ফেরত দিয়েছে বিধাতা ২৪ ঘন্টার জন্য। আমি সফলভাবে এই ২৪ ঘন্টা অতিক্রম করতে পারলেই আমার তন্দ্রাকে সারা জীবনের জন্য পেয়ে যাবো। নচেৎ আমার প্রার্থনায় প্রাপ্ত এই মিশনটা ব্যর্থ হবে এ জীবনের জন্য। আমি কাউকেই জানাইনি বিষয়টা, শুধু তন্দ্রার সাথে দেখা করে অফিসে এসেছি রাত্রীকালীন কর্মের পর্যবেক্ষণের জন্য। আমি তন্দ্রাকে ভালোমন্দ কিছুই বলিনি কারণ- ভয়টা তখনও আমার মধ্যে কাজ করছিল, যদি আজ আবার আমার অন্য কোন ভুলের জন্য তন্দ্রাকে হারাই তবে বিধাতার কাছে চাইবার বা বলবার আমার আর কোন পথই অবশিষ্ট থাকবে না। অফিসে বসে এক মনে শুধু ভাবছি কিভাবে ২৪টা ঘন্টা পার করবো, কিভাবে তন্দ্রাকে ধরে রাখবো, কল্পনার পোকাটা তখনও মাথার ভেতর রঙিন জাল বুননে ব্যস্ত। আমি শুধু সময়টা পার করবার জন্য ঘড়ির সেকেন্ড কাউন্ট করছি পলকে পলকে। হঠাৎ অফিস বয়ের চিৎকারে পুরোটা চৈতন্য ফিরলো আমার-
-স্যার, স্যার, বাটন হোলের নাসিমার মেশিনে হাত কেটে গেছে অনেকখানি, কোনভাবেই রক্ত বন্ধ হচ্ছে না, কি করবো স্যার?
-কি করবে মানে তাড়াতাড়ি এখানে নিয়ে এসো মেয়েটাকে।

-ঠিক আছে স্যার।

অফিস বয় মামুন সহ ২/৩ জন মহিলা শ্রমিক মিলে নাসিমাকে নিয়ে আসে আমাদের রুমে। গজ কাপড় দিয়ে হাত বেঁধেও রক্ত বন্ধ হচ্ছিলনা বলে বাধ্য হয়ে শোভাকে ফোন দিলাম। শোভা বাসা থেকে এসে নাসিমাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে সুপারভাইজার শিপনকে দিয়ে নাসিমাকে তার বাসায় পাঠানোর ব্যবস্থা করে। হঠাৎ নিজেকে অনেক ক্লান্ত মনে হয়, হাতঘড়িটা খুলে পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে টেবিলের উপর রেখে ওয়াসরুমে যাই। আমি ওয়াসরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে চেয়ারে বসতেই শোভা বলে, স্যার কে যেন একটা মহিলা আপনাকে ফোন দিয়েছিল। তন্দ্রার ফোন-

-হ্যালো, কি ব্যাপার তন্দ্রা, হঠাৎ এতো রাতে ফোন দিলে?

-এতো রাতে ঐ ডাইনিটা তোমার ফোন রিসিভ করল কিভাবে?

-তন্দ্রা হয়েছে কি, রাত্রে হঠাৎ কারখানায় একটা দুর্ঘটনা ঘটায়.....

ওপাশ থেকে ফোনের লাইন কেটে দেয় তন্দ্রা। আমি তড়িঘড়ি করে সিকিউরিটি গার্ডকে ডেকে মোটামুটি বক্কের প্রসেস বুঝিয়ে ফ্যাক্টরী ম্যানেজারকে বলে বাসার পথে রওনা হই দ্রুত। বাসার গেটে নক করতেই সাবলেট ভাবী গেট খুলে দেয়। আমি দ্রুত আমার রুমে প্রবেশ করি। রুমের দরজার বন্ধ করে তন্দ্রা তন্দ্রা বলে ডাকতে থাকি। সিলিং ফ্যানের সাথে গলায় রশি দেওয়া তন্দ্রার লাশটা ঝুলছে দেখতে পাই স্পষ্ট।

তোমার জন্য ভালবাসা

শেখ আনিচুর রহমান (আনিচ)
ইন্সপেক্টর, কিউসি
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

অনেক খানি স্বপ্ন দিলাম
মনের মতো সাজিয়ে নিও।

হরেক রকম রঙ দিলাম
স্বপ্নগুলো রাঙিয়ে নিও।

এক আকাশ নীল দিলাম
নীল আকাশে হারিয়ে যেও।

এক রাশ জোছনা দিলাম
মনটাকে সাজিয়ে নিও,

এক বুক ভালবাসা দিলাম
যত্ন করে রেখে দিও।

কোন এক কুসুমের গল্প

মোসাঃ হনুফা
সিনিয়র অপারেটর
সুরভি গার্মেন্টস লিমিটেড

বাংলাদেশের এক নদীপাড়ের গ্রামের মেয়ে কুসুম। নদী ভাঙ্গনে তাদের সবই গেছে, আছে শুধু ভিটেটুকু। বাবা অসুস্থ, মা গ্রামের গৃহস্থ ঘরে কাজ করে। যৌতুকের কারণে বড় বোনের স্বামীর ঘরে জায়গা হয়নি। সে দরিদ্র বাবার ঘরে ফিরে এসেছে। ঘরে আরো আছে ছোট দুটি ভাই।

গ্রামের স্কুলে কুসুম অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। ১৫-১৬ বছর বয়স থেকেই কুসুমের বিয়ের প্রস্তাব আসতে থাকে। বড় বোনের অবস্থা দেখে সে বিয়ে করতে রাজী হয়নি। সিদ্ধান্ত নেয় নিজে উপার্জন করবে। মা-বাবা ও পরিবারের পাশে দাঁড়াবে। পাশের বাড়ির রেহানার সাথে ঢাকায় গার্মেন্টসে চাকরি করার সিদ্ধান্ত নেয়। একদিন সে ঢাকায় চলে আসে রেহানার সাথে। কিছুদিন পর চাকরি হয় এক গার্মেন্টসে। মাসে বেতন হয় ১৬৬২ টাকা। শুরু হয় তার নতুন জীবন, নিজের আয়ে চলতে শেখা এক নতুন জীবন।

সময় বয়ে চলে, চাকরিতে উন্নতি হয়। বেতন বাড়লে বছর দুয়েক পর সে তার এক ভাইকে ঢাকায় নিয়ে আসে এবং দোকানে চাকরি জোগাড় করে দেয়। এভাবে দেখতে দেখতে চার বছর পার হয়ে যায়। তার হাতে কিছু টাকা জমে। এই জমানো টাকা দিয়ে কুসুম তার বড় বোনকে একটি সেলাই মেশিন কিনে দেয়। বড় বোন গ্রামে সেলাই কাজ করে আয় রোজগারের সুযোগ পায়। তার বাবা এখন সুস্থ। পরিবারটিতে স্বচ্ছলতা ও আনন্দ ফিরে এসেছে। কুসুম কল্পনা করে সামনে আরো ভালো দিনের। এখন সে বিয়ের কথা ভাবছে। যৌতুক নেবে না এমন কাউকে বিয়ে করবে সে। তার মনোবল, সাহস ও স্বপ্ন দিন দিন তাকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

সোনার মেয়ে সেজুতি

মোঃ নুর আলম
সিনিয়র অফিসার, প্যাটার্ন
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

ধন্য জীবন ধন্য আমার
বুক ভরেছে সুখে,
সোনার মেয়ে জন্ম নিল
আমার পোড়া বুকে।

সন্তানের মুখটি দেখে
দুঃখ হল দূর,
অলক্ষীটা পালিয়ে গেল
লক্ষী বাজায় সুর।

সারা জীবন বেঁচে থাক
আমার চোখের জ্যোতি।
তুমি আমার লক্ষী মা
সোনার মেয়ে সেজুতি।

নীল জোনাকী

সংগীতা আক্তার পারমিন
সিনিয়র অপারেটর
অবনী নিট ওয়্যার লিমিটেড

ভালো লাগে আঁধার রাতে
তারার মলিন আলো।
ভালো লাগে দুঃখের মাঝে
বাসতে তোমায় ভালো।

নীল জোনাকী আলো দিবে-
চাঁদের আলো নিভে যাবে,
কষ্টগুলো হাত বাড়াবে,
স্বপ্নেরা সব জেগে রবে।

তখন তুমি হাত বাড়ালেই
আমায় খুঁজে পাবে।
নীল জোনাকীর নীলাভ আলোয়
আঁধার ভেসে যাবে।

অপমৃত্যুর রক্ষাকবচ

প্রদীপ কুমার দত্ত
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
ওভেন টপ্‌স, ব্যাবিলন গ্রুপ

পরের দিন ভোরের আলো ফোঁটার আগেই কাজে বের হতে হবে। কাজতো নয়, লোকে বলে ভিক্ষা। কিন্তু এটাই তার রোজকার কাজ। প্রতিদিন হাজার লোকের ভীড়ে প্রতিটা মাছের আড়ৎদারের টং এর সামনে ব্যাগ বাড়িয়ে দাঁড়াবে আর আড়ৎদার দয়াপরবশ হয়ে কিছুটা বিরক্তির সাথে একটা দুটা উচ্ছিষ্ট ছোট মাছ তার ব্যাগে ছুড়ে মারবে। কোলের শিশুকে কাঁধে নিয়ে কাওরান বাজারের ভীড়ের মধ্যে এভাবে সংগৃহীত মাছগুলো আবার বিক্রি করতে হবে রেল লাইনের ধারের অস্থায়ী বাজারটাতে। কাঁধের শিশুটা তখন পাশে বসে মায়ের সাথে প্যান প্যান করতে থাকবে কিংবা বিস্ময়ের সাথে মাছ বেঁচা দেখতে থাকবে। মাছ বিক্রির ভেজা-নোংরা টাকাগুলো থলিতে গুঁজে রেখে মাছের আড়তে ফেরত যেতে হবে টংগুলো পানি দিয়ে ধুয়ে সাফসুতরো করার জন্য। জীবন-জীবিকার তাগিদে রহিমার নিত্যকার কাজ এটাই। এই কাজের বিনিময়ে আয় দিয়ে তাদের দুজনের পেট চলে। যেহেতু কালকে হরতাল তাই অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশ আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে। রাতের আঁধার থাকতে বেরুতে পারলেই ভালো হয়। সকাল সকাল মাছ সংগ্রহের কাজ সেরে রহিমা চলে আসে রেল লাইনে।

ইতিমধ্যে পরপর ছয় সাতটা ট্রেন চলে যায় এধার থেকে ওধারে। কড়া হুইসেল বাজিয়ে মুহূর্তের মধ্যে এক একটা ট্রেন চলে যায়। রেল লাইনের ধারে বস্তির মানুষগুলো এর কিছুরই ধার ধারেনা। রেল লাইনের উপর পসরা সাজিয়ে যারা রোজ পন্য বিক্রি করে তারা কিন্তু খুবই সতর্ক। একটু আগেই একটা ট্রেন যাচ্ছিলো। হটহাট করে ক্রেতা-বিক্রেতারা নিরাপদ দুরে সরে দাঁড়ালো। শুধু দুর্ভাগা রহিমাই ব্যর্থ হলো শেষ রক্ষা করতে। একটা পা ট্রেনের চাকার তলায় আটকা পড়ে মুহূর্তের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো তার। আকস্মিক এ ঘটনায় যা হয়-উৎসুক জনতার ভীড় বাড়তে থাকলো। রহিমা পড়ে আছে লাইনের পার্শ্বে, পায়ের বিচ্ছিন্ন অংশ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে। জ্ঞানহীন রহিমার হাত ধরে খানিকক্ষণ পরে কে একজন বলে উঠলো, বেঁচে আছে, তাড়াতাড়ি মুখে পানি দাও। দুর্ঘটনার সময় রহিমার পাশে থাকা দেড় বছরের শিশুটি ছিটকে গিয়ে লাইনের পাশে পড়ে আছে। ওর অবশ্য কিছুই হয়নি।

রতন-জগলুল-মুহিত, তিনজন সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ করেছে। মহানগরের একটি মেসে থাকে তারা। পরীক্ষা এবং ফল প্রকাশের মাঝের এই দীর্ঘ সময়টাতে কি করবে এ যুবকত্রয় তার কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় সকালের টিউশনির পর গন্তব্যহীন বাইরে বেরিয়ে পড়বে তারা। প্রতিদিন অন্তত একটা ভালো কাজ করা চাই, সেটা মুমূর্ষু রোগীর জন্য রক্ত জোগাড়, অসহায় কাউকে সম্ভব সহায়তা দান কিংবা আহতের চিকিৎসা, যাই হোক না কেন। মন্দ কাজের আধিক্য সমাজে এতটাই বেশি যে ভালো কাজের অভাব হওয়ার কথা নয়।

সেদিন ছিলো কঠিন রাজনৈতিক কর্মসূচী। আগের দিন রাতেই গাড়ী ভাংচুর, জ্বালাও পোড়াও এর বিস্তর ঘটনা ঘটেছে শহর জুড়ে। জনমনে আতংক বিরাজমান। এ ধরনের উম্মাতাল আর থমথমে সকালবেলা ওরা তিন বন্ধু কাওরান বাজারের পাশের রেল লাইন ধরে হাঁটতে থাকে। হঠাৎ এক জায়গায় মানুষের জটলা আর চিৎকার চেঁচামেচি শুনে জটলার দিকে এগিয়ে যায় ওরা। একজন মহিলার পা ট্রেনে কাটা পড়েছে। অবস্থা গুরুতর। যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিতে হবে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে ওরা। ধরাধরি করে মহিলাকে এক প্রস্থ কাপড়ের উপর শুইয়ে দেয় তড়িৎ। কাপড়টাকে স্ট্রেচারের মতো ধরে মূল রাস্তায় নিয়ে আসে তিনজন। একটা ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করে। হরতালের কারনে যানবাহন খুব একটা নেই বললেই চলে। ইতিমধ্যে

দু'একটা ট্যাক্সির দেখা মিললেও মেডিকেলের দিকে যেতে রাজি হয় না কেউই । নিরুপায় হয়ে সময় গুনতে থাকে ওরা । বিরামহীন রক্তক্ষরণে মহিলার অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে । মাঝে মধ্যে গোঙানীর শব্দ ছাড়া আর কোন ধরনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না । এরই মধ্যে একটা ট্যাক্সি মিললো । ভাড়া দিতে হবে তিনশ টাকা । অগত্যা ছয় গুন বেশী ভাড়াতেই রাজি হতে হলো । রাস্তা ফাঁকা থাকায় মেডিকেলে পৌঁছতে দেরী হলো না । আউটডোর এর ফর্মালিটি সেরে মহিলাকে ইমার্জেন্সীতে নেয়া হলো । কর্তব্যরত ডাক্তার এবং নার্স অস্ত্রপচারের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ, ইন্‌জেকশন, ব্যান্ডেজ এবং অন্যান্য জিনিষপত্র বাইরে থেকে আনার জন্য একটা স্লিপ ধরিয়ে দিলো । কিন্তু সমস্যা হলো পকেটে তাদের এতো টাকা নেই । অগত্যা নিকটস্থ ফার্মেসীতে গিয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়ে হাতের ঘড়ি, মোবাইল সেট বন্ধক রেখে এবং চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে টাকা পরিশোধের আশ্বাস দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সংগ্রহ করা হলো । কিন্তু শুরু হলো নতুন বিপত্তি । আপারেশন এর সার্জন সাহেব এখনো আসেননি । কখন আসবেন কেউ বলতে পারেনা । হরতালের এই সশংক পরিস্থিতিতে ডাক্তারেরই বা কি দায় পড়েছে সময় মতো হাসপাতালে আসার জন্য । এদিকে আহতের অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে । উপস্থিত ডাক্তার এবং নার্স এর সাথে কথা বলা হলো । তারা নির্বিকার । তাদের কোন উদ্বেগ নেই । এ অবস্থায় কোন উপায় খুঁজে পায়না ওরা তিনজন । ডিউটি ডাক্তার এর কাছ থেকে ফোন নাম্বার নিয়ে সার্জনকে ফোন করা হলো । কোন উত্তর পাওয়া গেল না । প্রতীক্ষার পর প্রতীক্ষার পালা চলছে । সেই সাথে রক্তের স্রোতধারা বের হয়ে হাসপাতালের মেঝেতে মিশে যাচ্ছে রহিমার শরীর থেকে । একসময় তার অবসান হলো রহিমার জীবনাবসানের মধ্যে দিয়ে । এখন এ লাশ নিয়ে কি করবে ওরা তিনজন । এ ধরনের ঘটনার কোন অভিজ্ঞতা নেই ওদের । একজন পরামর্শ দিলো, থানায় গিয়ে পুলিশে খবর দেন । মৃতের সুরতহাল রিপোর্ট লাগবে ।

তিন বন্ধুর একজন মুহিত গেলো থানায় । ডিউটি অফিসার ভীষণ ব্যস্ত । পুরো থানার কাজ তিনি একাই সামলাচ্ছেন। কনস্টেবল, কর্মকর্তারা সব ব্যস্ত রাজনৈতিক কর্মসূচী সামাল দিতে । হাসপাতালে মৃত মহিলার বিস্তারিত তথ্য চাইলেন ডিউটি অফিসার । কিন্তু ওরাতো মহিলার সম্পর্কে কিছুই জানেনা । কি বিবরণ দেবে মুহিত । ওরা যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ঘটনার সাথে নিজেদের দায়বোধ থেকে জড়িয়েছে সেটা পুলিশকে বিশ্বাস করানো মুশকিল । প্রথমদিকে সন্দেহের চোখে তাকালেও শেষে কিছুটা নরম হয় অফিসারটি । ঠিক আছে আপনাদের অল্প বয়স; ছাত্র মানুষ; এসব হাঙ্গামায় কেন জড়াতে যাবেন ? যাই হোক একটা দরখাস্ত দেন । হাসপাতাল থেকে কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র নিয়ে লাশটি থানায় নিয়ে আসেন। তারপর আমাদের যা করার আমরা করবো ।

ইতিমধ্যে রতন রেল লাইনের ঐ স্থানে গিয়ে লাশ এর কোন আত্মীয়ের খোঁজ করে কাউকে পেল না । কোন আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী নেই ওর । লাশ এর যেহেতু কোন দাবীদার নেই শেষ ভরসা তাই আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম । মেডিকেল থেকে পোস্টমর্টেম সেরে থানার পুলিশ কর্মকর্তার ছাড়পত্র নেয়ার জন্য লাশ নিয়ে থানার উদ্দেশে রওনা হয় ওরা তিনজন । আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামের লাশবাহী গাড়ীটি টি এস সির কাছে পৌঁছাতেই একদল পিকেটার হামলা করে গাড়িটিকে । পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় গাড়ীটিতে । এ্যাম্বুলেন্স, লাশবাহী গাড়ী হরতালের আওতামুক্ত থাকার কথা থাকলেও দেশরক্ষার আন্দোলনের লড়াকু সৈনিকেরা তা মানবে কেন ? ওরাতো দুর্নিবার । ওরাতো দেশ উদ্ধারে নেমেছে । ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল পথচারী আর পুলিশ এবং ওরা তিন বন্ধু মিলে পানি আর বালি দিয়ে আগুন নেভাতে সক্ষম হয় । রহিমার লাশটি ততক্ষনে অর্ধভস্ম হয়ে গেছে । গলায় ঝুলে থাকা সর্ববিপদহরা তাবিজ ওর মৃত শরীরটাকে শেষ রক্ষা করতে পারলো না । রহিমার দেড় বছরের শিশুটিকে কে রক্ষা করবে ?

পরদিন সকালে বড় বড় হেড লাইনে খবর বের হলো । আগুনে ভস্মীভূত রহিমার লাশটিকে নিজেদের দাবী করলো একদল । অন্যদল বললো হরতালের নিষ্ঠুর বলি এই লাশ । ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতেও বিভ্রান্তিকর দাবী উঠলো । এই খবরের সাথেই একটা মিছিল দেখা গেলো । কতগুলো মানুষ শ্লোগান দিচ্ছে-জ্বালো, জ্বালো, আগুন জ্বালো । আগুন জ্বালো এক সাথে ।

মুহিত, রতন এবং জগলুল যে কোথায় আগুন জ্বালাবে তা বুঝতে পারছে না । হাসপাতাল, ডাক্তার, পুলিশ না ঐ ভয়ংকর অমানুষদের গায়ে ।

ব্যাবিলন

রেবেকা বেগম
সহকারী অপারেটর
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

হায়রে আমার ব্যাবিলন ...
কেড়ে নিলি সবার মন।

গ্রাম গঞ্জ ও শহরের
আছেন অপারেটর সবখানের।
এসে তারা সারাক্ষণ,
পোশাক বোনেন আপনমন।

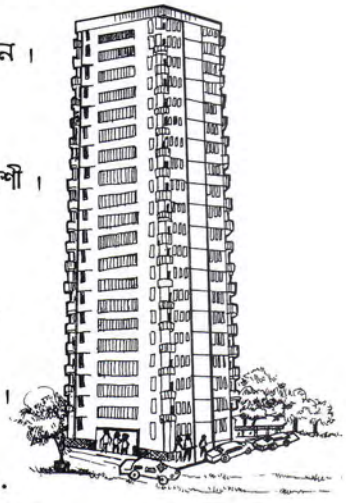

দেখে পোশাক বিদেশী
কেনেন তারা অনেক বেশী।

আনন্দেতে ব্যাবিলন
বেতন বাড়ায় সকলজন,
বেতন পেয়ে তাই সবার
রইলনাকো অভাব আর।

লোক মুখে রব এখন ...
ব্যাবিলন, ব্যাবিলন, ব্যাবিলন।

শ্রমিক

মোঃ আউলাদ হোসাইন
কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

আমরা হইলাম শ্রমিকবৃন্দ
সকলে কাজ করি,
শক্ত হাতে এদেশটাকে
তিলে তিলে গড়ি।

আমরা শ্রমিক দেশের তরে
ঝরাই দেহের ঘাম,
তবু কেন লাঞ্ছিত হই
পাইনা ন্যায্য দাম ?

কেউ করি কাজ কারখানাতে
কেউবা মাঠে ঘাটে,
কেউ করি গার্মেন্টসেতে
কেউবা পথে ঘাটে।

নানান পেশার নানান মানুষ
হরেক রকম কাজ,
ভোর হলেই যাই ছুটে যাই
নাই যে কোন লাজ।

দেশের যত ধনী জ্ঞানী
সকলের তরেই বলি,
উন্নতিটা মোদেরই হাতে
সৎভাবে যদি চলি।

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া

আব্দুল কাদির
ফ্যাক্টরী ম্যানেজার
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী জনপদ, খাসিয়া-জৈন্তা পাহাড়ের কোল ঘেষে বিস্তীর্ণ হাওড়-বিল-পাহাড়ের বুক চিরে বেরিয়ে আসা নদী-নালার রূপালী সৌন্দর্য আর টিলা পাহাড়ের সবুজের ভিতরে একটি গ্রাম চাঁদনী ঘাট। স্রোতস্বীনি সুরমা পাড়ের এই গ্রামটিতেই আমার জন্ম। গ্রামের আলো-বাতাস, সুরমার রূপালী জল, পথে পথে সবুজের শ্যামলিমা গায়ে মেখেই আমি শিশু থেকে কিশোর হয়েছি। সুরমার তীরে বসে দেখেছি সীমাহীন আকাশ, মেঘ, বৃষ্টি, রোদ আর দুরের টিলা পাহাড়ের সবুজের উপর আলো ছায়ার খেলা। সেই শৈশব এখন স্বপ্ন কথার মতো আমার স্মৃতিকে দোলা দিয়ে যায় মাঝে মধ্যেই। চাঁদনী ঘাট থেকে মাত্র দেড় মাইল দুরে আর একটি গ্রাম লক্ষনশ্রী। আমাদের গ্রামসংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও লক্ষনশ্রী কোন সাধারণ গ্রাম নয়। বহু বিখ্যাত মানুষের জন্মদাতা গ্রামের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হাছন রাজা। মরমী কবি-সাধক এবং একই সাথে বিখ্যাত জমিদার। এই জমিদার বাড়ির সামনের একটি সবুজ ঘেরা মাঠে বন্ধুদের সাথে প্রায় প্রতিদিনই আমি খেলায় মেতে উঠতাম। কিন্তু অবাক ব্যাপার হলো হাছন রাজার ঐ জমিদার বাড়িতে কখনোই আমার যাওয়া হয়নি। সেই সুদুর শৈশবে জমিদার বাড়ীর যে রূপকল্প আমাদের মধ্যে তৈরী হয়েছিলো আপাত দৃষ্টিতে বাড়িটিতে সে সবের কিছুই ছিলোনা। না ছিলো সিংহ দরজা, ফেরানো পাঁচিল কিংবা রাজার মতো আড়ম্বর। আমাদের খুবই সাধারণ মনে হতো সবকিছুই।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পর্যটক আসতেন বাড়িটি দেখার জন্য। আমরা ভাবতাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য তারা এসেছেন। এ অঞ্চলে আসলেই ভ্রমন পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই এ বাড়িতে একবার ঘুরে যেতেন। আমাদের খেলার সময় অনেকে আমাদের কাছেও বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইতেন। আমরা অবলীলায় তাদেরকে দেখিয়ে দিতাম, ঐ তো। আমাদের কাছে ব্যাপারটা ছিলো নিতান্তই হাছন রাজার বাড়ি।

একটা সময় আমি আমার পরিবারের সঙ্গে ঢাকায় চলে আসি। স্থায়ী আবাস গড়ে উঠে এই যান্ত্রিক শহরে। বহুদিন হলো ফেরা হয়নি আমার শৈশব কৈশোরের জন্মস্থানে। জীবন-জীবিকার তাগিদে সময় হয়ে উঠেনি আর। আমার শৈশব আর কৈশোর আমাকে এখন ভীষণভাবে হাতছানি দেয় আর হাতছানি দেয় সেই বাড়িটি যার পাদদেশে প্রতিদিন বিচরণ করেছি কিন্তু কখনোই ভিতরে যাওয়া হয়ে উঠেনি। বাড়িটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝতে পারিনি তখন। হাছন রাজার ইতিহাস নিয়ে তৈরী হওয়া চলচ্চিত্র দেখে আর তার সম্পর্কে কিছু পড়াশুনা করে আমার এখন আফসোস হয়। আমি সুনামগঞ্জের মানুষ। প্রসঙ্গত আমার বন্ধু-পরিচিত জনেরা অনেকেই হাছন রাজার বাড়িটি সম্পর্কে জানতে চাইলে আমি তাদেরকে কিছুই বলতে পারিনা ঐ মাঠের গল্প ছাড়া। তখন আমার কাছে কোন গুরুত্ব ছিলোনা ঐ রাজবাড়ীটির। এখন সেই অজ্ঞানতা মাঝে মাঝে আমাকে লজ্জায় ফেলে দেয়। কতবার জাফলং গিয়েছি। মাধবকুন্ডের জলস্রোতে সাঁতার কেটেছি। কক্সবাজারের বেলাভূমিতে বিশাল ঢেউয়ের মধ্যে লুটোপুটি খেয়েছি-অথচ রবীন্দ্রনাথের মতো আমাকেও বলতে হচ্ছে-

"দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।"

উদ্যান অরন্য

এস. এম. আরিফ রাজ্জাক
এসিসটেন্ট জেনারেল ম্যানেজার
ব্যাবিলন ট্রিমস লিমিটেড

চোখে স্বপ্ন
একটি শুন্য উদ্যানের
অ্যসিরিয়ান সম্রাটের মত নেই রত্নরাশী
নেই তস্কর মালী, যারা–
লুট করে আনবে রাজ্যের যত ফুল বৃক্ষ ।

দশ চোখে ছিলো সৃষ্টির স্বপ্ন
নিউরোসেল জুড়ে ছিলো
ইচ্ছে উদগীরন উন্মুখ লাভা ।

কালো গহবরে
শুন্যের মিথস্ক্রিয়ায়
শুন্য নক্ষত্রেরা–
সংখ্যার সাথে শুন্যের যোগে জেগে ওঠে ।
দশ হাতের নিবীড় পরিচর্যায় অবয়ব পাওয়া
শুন্য উদ্যানের কসমিক প্লাজমা
বিগ ব্যাং এর অত্যুঙ্গ কামনায় অধীর ।

অপার মমতায় রোপিত হয়
গোলাপ, বেলী, গাঁদা, সূর্যমূখী বীজ
এমনকি অশ্বত্থ ।

ঐ হাতগুলো যেন হাত নয়
গঙ্গোত্রী মুখ ।
ঐ হাতগুলো যেন হাত নয় সূর্য
পরম মমতায় পরিচর্যা করে
জল দিয়ে, আলো দিয়ে
রোপিত বীজগুলোর অঙ্কুর উদগম ।

পাঁচ মালীর দশ চোখের
স্বপ্ন নিংড়ে অঙ্কুর থেকে চারা
চারা থেকে বৃক্ষ ।

ওটা উদ্যান নয়, এখন এক অরণ্য ।
পুষ্পিত বৃক্ষরাজীর প্রগাঢ় ছায়ায়
বেড়ে ওঠে অজস্র প্রাচীন ও নব প্রাণ ।

মৃত্তিকা যেমন শস্যকে ধারণ করে স্বস্নেহে
তেমনই এ অরণ্য তার বিশাল ডানার ওমে
জন্ম দেয় জীবন, বিশ্বাস ও বোধের ।

ধ্যান মগ্ন ঋষির মত মোহহীন
পঞ্চপান্ডব কি নিষ্ঠার সাথে
নির্মান করে চলেন–
এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মের জন্য
শুন্য উদ্যান
জীবন অরন্য
ব্যাবিলন ।

মশা

মোসাঃ ফেরদৌসী
অপারেটর
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

মশা তোমার বাড়ি কোথায়,
কোথায় তুমি থাক ?
শীত কালেতে লুকিয়ে থাক,
গরম কালে আস ।

দুষ্ট মশা মিষ্টি সুরে
গান শুনিয়ে যাও ।
গান শুনিয়ে, মন ভুলিয়ে
রক্ত চুষে খাও ।

মশা তুমি এত্ত ছোট
তবু কর ক্ষতি
তাইতো সবাই তোমার জ্বালায়
জ্বালাই কয়েল বাতি ।

সোনার হরিণ কোন বনেতে থাকো?

সুলতান আহমেদ
ডেপুটি ম্যানেজার
জুনিপার এমব্রয়ডারীজ লিমিটেড

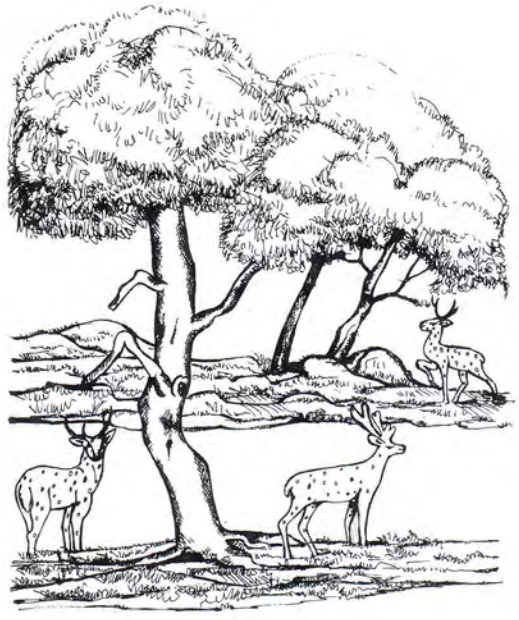

আগামীকাল সূর্য উঠার পরপরই সুন্দরবনের উদ্দেশে বাসা থেকে রওনা হব। বিশ্বের অন্যতম নয়নাভিরাম সুন্দরবন। যে বনে রয়েছে ভয়ঙ্কর রয়েল বেঙ্গল টাইগার, মায়াবি চিত্রা হরিণ আরো কত জীব-জন্তু। স্বাভাবিকভাবেই মানসিক উত্তেজনা আর আগ্রহ রাতের অনেকটা জুড়ে আচ্ছন্ন করে রাখে। পশ্চিম ধানমন্ডির মধুবাজারের বাসায় সফর সঙ্গী আমার স্ত্রী ইয়াছমিন। সেও কাপড় -চোপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গোছাতে ব্যস্ত। দরকারী কোন কিছু নিতে যেন বাদ না পড়ে যায়।

দুই হাজার দশ সালের জুলাই মাসে একদিন ভোরবেলা বাসা থেকে পূর্বনির্ধারিত বাসে করে রওনা দিলাম। দলে আমরা চল্লিশ জন। লেখক, সাংবাদিক, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, সব পেশার ভ্রমণ পিপাসুই আমাদের দলে আছেন। আমি এবং আমার স্ত্রী অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, আমাদের নাঈম স্যার যাত্রার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে পুত্র আবির, কন্যা অবন্তি ও ভাবীর সাথে আমাদের জন্যও দুইটি টিকিটের ব্যবস্থা করেছিলেন।

সকাল নয়টা ত্রিশ মিনিট। শীতলক্ষ্যা নদীর মাঝে দেখতে পেলাম সুন্দরবন ভ্রমণের লঞ্চ। ছোট স্পিডবোটে করে আমাদেরকে কয়েকভাগে লঞ্চে উঠানো হলো। নীচতলায় ছোট হলরুম। খাওয়া এবং আলোচনাসভার জন্য চেয়ার টেবিল সাজানো আছে। পাশেই ষ্টোর, রান্নাঘর ও স্টাফদের থাকার রুম। দ্বিতীয় তলায় পর্যটকদের জন্য কেবিন। প্রতি কেবিনে শোয়ার জন্য উপরে নীচে দুই তলা খাটের ব্যবস্থা আছে। লঞ্চের তৃতীয় তলায় সামনের দিকে কিছু অংশ চালক এবং বাকী পুরো ছাদই খোলামেলা হাঁটাচলার জন্য সুন্দর জায়গা।

বর্ষাকাল, ভরা নদী। ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে লঞ্চ। ঠান্ডা হাওয়ায় সারা শরীরে শীতের পরশ লাগে। সবাই বুক ভরে নিচ্ছেন নির্মল বাতাস। আমরা যার যার কেবিনে কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে সকলে নিচে চলে এলাম। সকালের নাশতা প্রস্তুত। পরটা, ভাজি, মুরগিভুনা, সুজির হালুয়া। সেলফ সার্ভিস। ইচ্ছেমতো প্লেটে তুলে নিলাম। পেট ভরে নাশতা খাওয়ার পর চা খেতে খেতে অভিজ্ঞ ট্যুরিস্ট গাইড জানালেন লঞ্চে অবস্থানকালে থাকা-খাওয়া চলাফেরার নিয়মাবলী যেমন- খাবার পানি অপচয় করা যাবে না। নদীপথে সহজেই অঢেল বিশুদ্ধ পানি সাপ্লাই পাওয়া সম্ভব নয়।

নদীর বুক চিরে আমাদের লঞ্চ দ্রুত গতিতে ছুটছে। আমাদের অনেকেই এখন লঞ্চের ছাদে। নদীর দুই পাড়ের দৃশ্য দেখতে দেখতে এক সময় দুপুর হয়ে আসে। দুপুরের খাবারের ডাক আসে, আমরা সবাই নীচে ছোট হলরুমে চলে আসি। ডাল, ভাত, সব্জি, খাসির মাংস, সালাদ, ফল পর্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়া আছে। বেশী করে খাবার প্লেটে তুলে নিয়ে আমি আর ইয়াছমিন ডাইনিং-এর কিনারায় রাখা টেবিলে বসে পড়লাম। যাতে খাওয়া এবং নদীর পাড়ের দৃশ্য দেখা দুটোই হয়। নদীর জলে চলন্ত ডাইনিংরুমে বসে নতুন অভিজ্ঞতা আর আনন্দের মাঝে খাওয়ার পর্ব শেষ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার জন্য আমরা দোতলায় কেবিনে চলে আসি।

বিকালে ছাদের উপর খোলা জায়গায় ভাই-ভাবীদের গল্প বলার আসর বসেছে। আমরাও দ্রুত ছাদে এসে সামনে পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে পড়লাম। একের পর এক গল্প বলা আর হাসি আনন্দের মাঝে জাহাজের ক্ষুদ্র পরিসরে আমরা একে অপরের খুব কাছের মানুষ হয়ে গেলাম। ভাই-ভাবীদের আন্তরিকতা আর সুন্দর মনের পরিচয় পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত।

এখন সন্ধ্যা। ইন্টারনেটের বদৌলতে সহযাত্রী ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মোবাইলের স্ক্রিনে নদীপথে কোথায় আমাদের লঞ্চের অবস্থান তা দেখে নিলাম। শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী পার হয়ে এখন আমাদের লঞ্চ মেঘনা নদী দিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটছে।

রাতেও দুপুরের মতো ঘন ডাল, ভাত, মাছ, ঘন দুধের পায়েসসহ বিভিন্ন পদের ব্যবস্থা ছিল। নীচতলায় ছোট হলরুমে খাবারের পূর্বে বনের ভিতর কিভাবে চলাফেরা করতে হবে তার উপর ব্রিফিং সেশন হলো। জানতে পারলাম কটকা, কচিখালি, দুবলার চর, করমজল প্রভৃতি স্থানে হরিণের বিচরণ বেশি দেখা যাবে।

আঁধারের রূপ উপভোগ করার জন্য ইয়াছমিনকে নিয়ে আমি জাহাজের ছাদে উঠে এলাম। খোলা আকাশের নীচে দক্ষিণের বাতাসে শরীর শীতল হয়ে আসে। আমরা একে অপরের কাছাকাছি নীরবে দাঁড়িয়ে থাকি। বিশাল নদীর সারা বুক জুড়ে জেলেদের মাছ ধরার নৌকায় ছোট ছোট বাতির আলো। পথ চলতে চলতে দুইজনে হিসেব করি জীবনের কতটা পথ পার হয়ে এসেছি। হারানো দিনের কথা মনে আসতে থাকে। আমাদের একমাত্র সন্তান আছিফ অনেক বড় হয়েছে। সে আজ দুরদেশে লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত। রাত এগারটা। আজকের মতো বাকি রাতটুকু যাত্রাবিরতি দিয়ে আমাদের জাহাজটি নোঙ্গর করলো। এবার জাহাজের স্টাফদের বিশ্রামের পালা। তাছাড়া আমাদের জন্য মাছ, মাংস, তরি-তরকারি ইত্যাদি সংগ্রহ করা হলো। ক্লান্ত শরীর। এখন ঘুমের প্রয়োজন, অন্যান্য ভাইভাবীদের অনেকেই তাদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যার যার কেবিনে চলে গিয়েছেন। আমরাও আমাদের কেবিনে চলে এলাম। দুই তলা খাটের উপরের তলায় আমাকে উঠতে হলো। বেশ কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারলাম এখানে আমার ঘুম আসবে না। দুইজনে মিলে উপরের বিছানার জাজিম নিচে নামিয়ে শোয়ার ব্যবস্থা করে নিলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি লঞ্চ অনেক আগেই আবার চলতে শুরু করেছে। দ্রুত মুখ ধুয়ে নাশতা খাওয়ার জন্য নীচে ডাইনিং এ চলে এলাম।

সকাল নয়টা। পরিষ্কার আকাশ। অবশেষে আমরা দেখতে পেলাম বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন। গহিন অরণ্যে যেতে হলে সঙ্গে দুই-তিন জন অস্ত্রধারী বনপ্রহরী নিতে হয়। তা না হলে যে কোন মুহূর্তে বাঘ এসে যে কাউকে ধরে নিয়ে যেতে পারে। সামান্য একটু পায়ে হেঁটে যাওয়ার পর ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিস। বনের ভিতর যাওয়ার অনুমতিপত্র আর তিনজন বনপ্রহরী নিয়ে আমাদের লঞ্চ বনের ভিতরে আবার চলতে শুরু করল। শাড়ীর আঁচলের মত বনের কিনারায় একটু নিচু এলাকায় থরে থরে গোল গাছের সারি। দেখতে খুবই সুন্দর। নারিকেল পাতার মতো পাতা। গ্রামাঞ্চলে সাধারণত: টিনের পরিবর্তে ঘরের চালে গোলপাতা ব্যবহার হয়ে থাকে।

কিছুদুর চলার পর আমাদের লঞ্চ নোঙ্গর করা হলো। দুই দলে বিভক্ত হয়ে আমরা ইঞ্জিন চালিত নৌকায় উঠলাম। দুই পাশে ঘন জঙ্গল, মাঝখানে সরু খাল দিয়ে ধীরে ধীরে পথ চলা, যেন প্রকৃতির সঙ্গে আলিঙ্গন। নির্মল নির্জন পরিবেশ আর পাখির কলতানে আমরা সবাই মুগ্ধ। বনের মাটি সব সময় ভিজা থাকে কারণ ছয় ঘন্টা পর পর জোয়ার এলে বনে লোনা পানি ঢুকে কিছুক্ষণের জন্য ডুবে যায়। হঠাৎ আমাদের একজন চিৎকার করে উঠল, ঐ যে হরিণ! আমরা দেখতে পেলাম মায়াবী চিত্রল হরিণের চোখ ধাঁধানো চাহনী। নৌকার ইঞ্জিনের শব্দে মাঝেমধ্যে গাছের ফাঁকে লাজুক হরিণগুলো ভয়ে আমাদের দিকে তাকায়। কোথাওবা দুই পা উপরে তুলে দুই পায়ে দাঁড়িয়ে ছাতার মত ছড়ানো গাছের পাতা খাচ্ছে। সুন্দরবনে ভ্রমণে আসা দেশী-বিদেশী পর্যটকদের বিভিন্ন প্রকৃতির প্রাণীর মধ্যে প্রধান আকর্ষণীয় প্রাণী হলো এই মায়াবী চিত্রল হরিণ। জানা যায়, সুন্দরবনে প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার হরিণ আছে। বেশ কিছুদুর বনের ভিতরে চলে এসেছি। মনে হয় বনের যেন কোন শেষ নেই। এবার ফেরার পালা।

ভ্রমণ কর্তৃপক্ষ নদীপথ ভ্রমণ যেন অনেক আনন্দের হয় সেই জন্য বার বার সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা রেখেছেন। দুপুরের খাবারের পর এবার সুযোগ হলো আমাদের মধ্যে একটু সাহসী এবং অভিজ্ঞ কয়েকজনের সাথে বনের ভিতর বিশেষ জায়গায়

যাওয়ার, যেখানে বাঘের দেখাও মিলতে পারে। শিশু ও মহিলারা এ যাত্রায় বাদ। নৌকায় করে কিছুদুর যাওয়ার পর কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলাম। সারিবদ্ধভাবে বনের ভিতরে চলতে থাকি। সামনে পিছনে বনরক্ষী। দুইপাশে বড় বড় ঝোপ। সবুজের মধ্যে মাঝে মাঝে হলুদ পাতা, তাই হরিণ শিকারে বাঘেরা নাকি এই ঝোপের ভিতর লুকিয়ে থাকে। ভয়ে দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকি। কিছুদুর এসে বনবিভাগের তৈরি একটি উঁচু টাওয়ারে উঠে পড়ি। ঘন বনের মাঝে কয়েকটি ফুটবল খেলার মাঠের সমান খোলা জায়গা। হাঁটু সমান উঁচু কচিঘাস সারামাঠ জুড়ে। টাওয়ারের উপর চুপচাপ বসে আছি। কথা ছিল আস্তে কাশিও দেওয়া যাবে না। দুপুর পার হয়ে এখন বিকাল। মাঠের তিনদিক থেকে হরিণ দলে দলে মাঠের ভিতর আসতে থাকে। শুধু কচিঘাস খাওয়া ছাড়া তাদের আর কোন দিকে খেয়াল নেই। এক ঘন্টার মধ্যে কয়েকশ হরিণ দেখতে পেলাম। হঠাৎ বাঘের গর্জন কানে এল। কিছুক্ষণের মধ্যে হরিণ শিকারে বাঘের দৌড় দেখতে পাব। আমরা সবাই এত উঁচুতেও মাথা নিচু করে রাখলাম যাতে বাঘ আমাদের দেখে না ফেলে। না সবই ভুল, মাথা নিচু করতে যেয়ে সিঁড়ির ফাঁক দিয়ে দেখি আমাদের এক সাথি পাঁচতলা টাওয়ারে চারতলায় নাক ডেকে ঘুমে বিভোর।

ভ্রমণের তৃতীয় দিনে আমরা দলের সবাই বনের আরেক অংশ দেখার জন্য পায়ে হেঁটে রওনা দেই। অনেক কষ্টে আমরা সবাই একে একে লম্বা কাঠের পুল পার হয়ে বড় একটি পুকুরের পারে এসে পৌঁছি। প্রাকৃতিক উপায়ে বৃষ্টির পানি পান করার জন্য পুকুরে সংরক্ষণ করে রাখা আছে। পুকুরের তিনদিকে ঘন বন, একদিকে ফরেস্ট অফিস। বনকর্মী জানালেন, পুকুরের ঐ পাড়ে প্রায়ই বাঘ, হরিণ মিঠা পানি খেতে আসে। পুকুরের পাড় ঘেষে একটু এগিয়ে হালকা কাদামাটিসহ সরু রাস্তা পেরিয়ে আমরা একটি উঁচু পর্যবেক্ষণ টাওয়ারের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক শোভা দেখলাম। চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। দিগন্ত বিস্তৃত সুন্দরবনের সুন্দরী, কেওড়া, পশুর, গরান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ দেখে যে কেউ বিমোহিত হয়ে উঠবে। পর্যবেক্ষণ টাওয়ার থেকে নেমে আমরা নদীর ঘাটে আসি। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নৌকায় উঠি। কিছুদুর আসার পর আমরা নোঙ্গর করা লঞ্চে উঠলাম। লঞ্চে উঠার সময় প্রত্যেকের হাতে এক গ্লাস মাঠা দেওয়া হয়। গরমে তৃষ্ণায় মাঠা খেয়ে সকলের শরীর ও মন সতেজ হয়ে উঠে।

সুন্দরবনের দক্ষিণ পাশে আছে বঙ্গোপসাগর। বনের ভিতর দিয়ে সরু পথ দিয়ে অনেকটা দুর হেঁটে যাওয়ার পর দেখা গেল কূল-কিনারাবিহীন বঙ্গোপসাগরের অথৈ পানি। কিছুটা কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতের মত। ছোট সৈকতে সকলে স্নান করার আনন্দ উপভোগ করলাম। এ সময় দুপুরের রৌদ্রে সাগরপাড়ে বালির মধ্যে বসে বিট লবন আর মরিচ ফাকি দিয়ে আমড়া খেয়ে আমরা অমৃতের স্বাদ পেয়েছিলাম।

আজ রাতই হবে সুন্দরবনে আমাদের শেষ রাত। লঞ্চের ছাদে বার-বি-কিউ হবে। আমরা সকলে সন্ধ্যার পর ছাদে উঠে এলাম। প্রত্যেকের জন্য বসার ব্যবস্থা ছিল। লঞ্চের পিছনের দিকে বড় স্টিলের চুলায় রাখা কয়লায় আগুন দেয়া হল। নদীবক্ষে খোলা জায়গায় বাতাসের বেগ বেশি থাকায় অতি সহজেই মাছ মাংস কয়লার আগুনে গ্রিল করা গেল। এদিকে সকলকে অভিনয়, গল্প বা কৌতুকে অংশ নেওয়ার জন্য বলা হল। এক সময় আমার বলার পালা এসে গেল। আমি ছোট একটি কৌতুক বলি। বাবা তার দুই বাচ্চাকে ডেকে বললেন- শোন, যে বেশি মায়ের কথা শুনবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। এক বাচ্চা আর এক বাচ্চাকে বলল- চল বাবার কথা শুনে আমাদের কোন লাভ নেই, বাবাই পুরস্কার জিতবে।

খাবার প্রস্তুত। পোড়ানো মাছ, মাংস দিয়ে সবাই আনন্দ করে ছাদে বসে রাতের খাবার খেতে খেতে জানতে পারি আগামীকাল সকালে আমাদের ফিরতি যাত্রা শুরু। নির্জন অরণ্য ছেড়ে আমরা আবার ব্যস্ত শহরের কোলাহলে ফিরে যাব। রাত বাড়তে থাকে; একে একে সবাই যার যার কেবিনে চলে এলাম। নদীর মাঝে নোঙ্গর করা লঞ্চের কেবিন থেকে রাতের আঁধারে দেখতে পেলাম বনের আর এক রূপ। তর তর করে বয়ে চলেছে নদীর জল। দুরে জেলেরা মাছ ধরায় ব্যস্ত। মায়ের কথা মনে পড়ল। মা কালো কাপড়ের উপর সুঁই সুতা দিয়ে সবুজ বনের মাঝে সোনালী রং-এর হরিণের ছবি এঁকেছিলেন। নীচে লেখা ছিল 'সোনার হরিণ তুমি কোন বনেতে থাক'। ছোট বেলায় কাঁচে বাঁধানো সে ছবি বার বার কত দেখেছি। মা সোনার হরিণের সন্ধান পেয়েছিলেন কিনা জানিনা, মনে মনে বলি-মা আমি এখন সুন্দরবনে, যেখানে সোনার হরিণ থাকে।

কিছু কথা

মাহবুবুর রহমান
ডেপুটি ম্যানেজার, ফিনিশিং
ব্যাবিলন ড্রেসেস লিমিটেড

জীবিকা জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষই সর্বোন্নত প্রাণী। এই উন্নত প্রাণীও তার জীবিকার জন্য স্বাভাবিক পথ যেমন বেছে নেয় তেমনি আবার খারাপ পথও অবলম্বন করে। আমাদের বংলাদেশে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের ক্ষুদ্র জায়গায় লোকসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। এই অল্প জায়গায় এতো লোকের বাসস্থান, কর্মসংস্থান খুবই কষ্টসাধ্য। পোশাক শিল্পের আবির্ভাব কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দারুণ সম্ভাবনা তৈরী করেছে, যেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের বেঁচে থাকার অবলম্বন জুটেছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো আমাদের দেশের মানুষ সর্বক্ষেত্রে তার মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে। যে কাজ করে মানুষের জীবিকা নির্বাহ হয় তার প্রতি ভালোবাসা প্রয়োজন। যে লোক রিকশাভ্যান চালায় সে তার কাজ শুরুর পূর্বেই কিংবা কাজ শেষে তার উপার্জনের অবলম্বনটিকে যত্নসহকারে ধুয়ে মুছে রাখে। তার পেশার প্রতি অনুগত থাকে। কিন্তু পোশাক শিল্পের কিছু কিছু কর্মী এ নিয়ম মানতে চায় না। তারা তাদের কাজের পরিবেশকে সুন্দর করে রাখার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই কথা শুনতে চায় না।

পোশাক শিল্পে দিনে প্রায় ১০/১২ ঘন্টা কাজ করতে হয়। এখানে কর্তা হিসাবে সুপারভাইজার বা ইনচার্জ থাকে। পিতা তার আদরের সন্তানকে ভুলভ্রান্তির জন্য শাসন করতে পারলে কর্মকর্তা কেন তার কর্মীর জবাবদিহিতা নিতে পারবে না। কর্মকর্তাকে সে ক্ষমতা দেয়া আছে। কর্মকর্তার উচিত সেই ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার করা। কর্মীর যেমন প্রতিষ্ঠানের প্রতি কিংবা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণের উপর অনুগত থাকা প্রয়োজন ঠিক তেমনি কর্মকর্তাগণকেও তার কর্মীদের প্রতি অভিভাবকসুলভ আচরণ দিয়ে একটি সুন্দর কর্ম-পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে।

আমাদের এই ঘনবসতিপূর্ণ দেশের মানুষ যদি আমাদের পরবর্তী বংশধরদের আবাসযোগ্য একটা ভূখন্ডের কথা না ভাবে তাহলে প্রজন্ম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? আজকের সুখের জন্য আগামীর পরিবেশকে যেভাবে আমরা নষ্ট করছি তাতে আমাদের সন্তানেরা কঠিন সংকটে পড়বে। পরিবেশ ধ্বংসের এই প্রতিযোগীতা বন্ধ করতে না পারলে আমাদের নদী থাকবে না, বৃক্ষ থাকবে না, কৃষি জমি নষ্ট হবে। পুকুর ভরাট হবে, আকাশ ভারী হয়ে যাবে, আমাদের নিঃশ্বাস গ্রহণ কঠিন হয়ে পড়বে।

পোশাক শিল্পের কর্মীগণকে বলি আপনারা যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করে আপনাদের পরিবারের অন্ন যোগাচ্ছেন তার প্রতি শ্রদ্ধা পোষন করুন। তার প্রতি অনুগত থাকুন। প্রতিষ্ঠানের শৃংখলা মেনে কাজ করুন। শৃংখলা না থাকলে ৮/১০ জনের একটা পরিবারও টিকে থাকে না সেখানে একটা প্রতিষ্ঠান তো অনেক বড় ব্যাপার। আপনার কর্মসংস্থানে যাদের কোন ভূমিকা নেই সেই সকল সুবিধা ভোগীদের ইন্ধনে প্রভাবিত কিংবা প্রতারিত হয়ে নিজের এবং দেশের ধ্বংস ডেকে আনবেন না। একবার ভাবুন তো এই শিল্প না থাকলে আপনি কি করে খেতেন! কোথায় গিয়ে দাঁড়াতেন? আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মালিকদের অবদান অমূল্য। তাদের এই মানুষ সম্পৃক্ত ব্যবসাকে অবলম্বন করে কত মানুষ যে তার পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুন্দর এবং সুষ্ঠু জীবন চালাচ্ছে তার কোন লেখাজোখা নেই। প্রত্যেকটা সংসারের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং অফুরন্ত দোয়া আপনাদের উপর বর্ষিত হউক। দেশের উন্নতির জন্য আপনাদের এই অবদান, জয়যাত্রা যুগ যুগ ধরে চলতে থাকুক। আমাদের প্রতি, শ্রমিকদের প্রতি, কর্মচারী-কর্মকর্তাদের প্রতি আপনাদের যে ভালোবাসা তা শেষ বয়স পর্যন্ত অব্যাহত থাকুক। কারণ আমরা যারা আপনার প্রতিষ্ঠানের শক্তি, শেষ বয়সে এসে তারা অনেকটাই শক্তিহীন হয়ে পড়ি। আমরা আপনাদের এই প্রচেষ্টার সাথে যেন সর্বোচ্চ সময় নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে পারি সেটাই আমাদের কামনা। বাস্তবতার মধ্য দিয়ে যেন আমাদের জীবন কাটে সুখী এবং সমৃদ্ধভাবে।

যার যা প্রিয়

সুলতানা খাতুন
পলিম্যান
ব্যাবিলন আউটফিট লিমিটেড

মেলায় গিয়ে কিনবো ফড়িং
প্রজাপতির গাড়ী,
লাল কালারে সবুজ জামা
ফুল বসানো শাড়ী ।
কিনবো পুতুল নানান রংয়ের
রিনিক ঝিনিক চুড়ি,
হলুদ পাখি নাটাই সুতো
নকশি কাটা ঘুড়ি ।

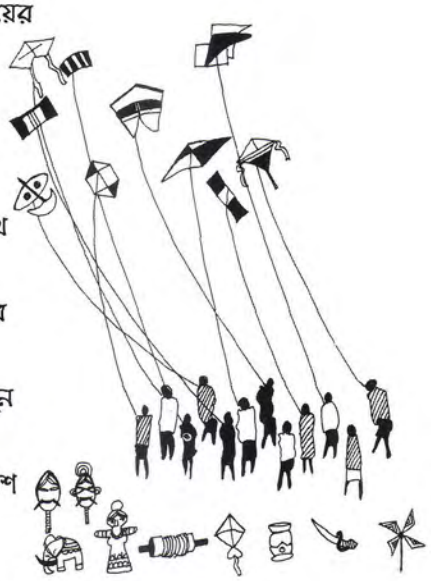

পাতার বাঁশি কিনবো সাথে
ঝিনুক পুঁতির মালা,
টিনের সাদা ঢাল তলোয়ার
কাঁসার বাটি-থালা ।
কিনবো আরো সাদা বেলুন
মাটির ষোড়া হাতি,
হরেক রকম ভূতের মুখোশ
ঝিলিক মিলিক বাতি ।

ভাঙলে মেলা ফিরবো বাড়ী
সব দেখিয়ে মাকে,
বলব তুমি বিলিয়ে দিও
যার যা প্রিয় তাকে ।

মনের ইচ্ছা

মোঃ এনামুল হক
নিটিং অপারেটর
অবনী টেক্সটাইলস লিমিটেড

জামালপুর জেলা আমার
সরিষাবাড়ী থানা,
আওনা ইউনিয়ন বসত বাড়ি
টিকরা পাড়া ঠিকানা ।

পিতা মাতা আদর করে
মানুষ করে- মোরে
টাকার জন্য পড়া লেখা
হয়নি তেমন ওরে ।

পিতা মাতার মুখের হাসি
দেখতে চাই ভাই,
কাজের খোঁজে বাড়ি ছেড়ে
ঢাকায় চলে যাই ।

অবশেষে হেমায়েতপুর
অবনী মিল গেট,
চাকরি একটা পেয়ে গেলাম
নিটিং হেলপারে সেট্ ।

অপারেটর সুপারভাইজার
সাহায্য করে মোরে,
মন লাগিয়ে কাজ করি ভাই
অভাব যায় দূরে ।

আকাশ ছোঁয়ার গল্প

উম্মে সালমা ডালিয়া
ম্যানেজার, প্যাটার্ন ও ক্যাড
ওভেন টপ্স, ব্যাবিলন গ্রুপ

প্রায় এক বছর যাবৎ চেষ্টা করছিলাম নীলগিরি দেখতে যাবো। কিন্তু কিছুতেই হয়ে উঠছিল না। আল্লাহ্ সেই সুযোগ আমাকে দিয়েছিলেন গত ৮ই জুলাই ২০১১ তে।

নীলগিরি বান্দরবন (বান্দরবান) শহর থেকে অনেক দুরে অবস্থিত। গাড়িতে গেলে প্রায় ৪ ঘন্টা সময় লাগে। স্থানীয়দের ভাষ্যমতে নীলগিরির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০০০ ফুটের কিছু বেশি হতে পারে। এই নীলগিরির সর্বোচ্চ চূড়ায় রয়েছে আমাদের সেনাবাহিনীর তৈরী করা মনোরম এবং সুদৃশ্য ৫টি কটেজ। যেহেতু সেনাবাহিনীর স্থাপনা তাই সেখানে যেতে হলে আগেই অনুমতি নিয়ে যেতে হয়। আসলে এসব কারণেই আমরা চটজলদি যেতে পারছিলামনা। যাক যেভাবেই হোক ভাইয়া অনুমতির ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। এক সপ্তাহ আগে থেকেই মানসিক প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। ৮ই জুলাই সকাল ঠিক পাঁচটায় ঢাকা থেকে বান্দরবনের উদ্দেশে রওনা দিলাম। আমরা পাঁচটা পরিবার একত্রে দুটি ১০ সিটের মাইক্রোবাস নিয়ে রওনা করেছিলাম। সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে বান্দরবন শহরে পৌঁছালাম। ওখানে পর্যটনের একটি মোটেল রুম ভাড়া করা ছিল আগে থেকেই। সেখানেই উঠলাম সবাই মিলে। লম্বা ভ্রমনের ক্লান্তিতে সবাই কোন রকম রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম। খুব সকালবেলা সবাইকে উঠতে হয়েছিল কারণ সকালেই আমরা রওনা করব নীলগিরির উদ্দেশে। রুম থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই চোখটা জুড়িয়ে গেল প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে। পুরো বান্দরবন শহরটাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। যেদিকে তাকাই শুধু সবুজ পাহাড় আর পাহাড়। ভাইয়ারা সবাইকে তাড়া দিচ্ছিল তাড়াতাড়ি নাস্তার পর্ব শেষ করে রওনা দেওয়ার জন্য। কিন্তু আমরা সবাই যেন বাচ্চাদের মতো হয়ে গিয়েছিলাম; যে যায়গায় হাটছিলাম সেখানেই একটা করে ছবি তুলে নিচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল পুরো এলাকাটাই ক্যামেরাবন্দি করে রাখি। ইতিমধ্যে আমাদের নীলগিরি যাওয়ার জন্য উপযোগী ফোর হুইলার ল্যান্ড ক্রুজার এসে উপস্থিত। তড়িঘড়ি করে সবাই গাড়িতে উঠে পড়লাম। গাড়িটার বর্ণনা না দিলেই নয়। পুরো হুড খোলা জীপ। খাঁচার মতো করে রড দেওয়া। শুধু চালকের আসনটুকু ঢাকা। চালক হচ্ছে পাহাড়ী বাঙ্গালী এবং তার হেলপার হচ্ছে উপজাতি। আমরা সবই মিলে অনেকটা চাপাচাপি করেই বসলাম। কারণ আমাদের সাথে ছিল অনেকগুলি বাচ্চা এবং তারাও সিটে বসেই যাবে। যাহোক, শুরু হলো আমাদের যাত্রা। প্রথমেই আমাদের মধ্য থেকে একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে গেল আরো ভালো করে প্রকৃতিটাকে দেখার জন্য। ওর দেখাদেখি বাচ্চারাও সবাই দাঁড়িয়ে গেল। সবচেয়ে মজার ছিল ওনার ধারা বর্ণনা। ২ মিনিট পরপর রাস্তার পার্শ্বে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা ছিল এবং উনি সেগুলো খুব জোরে জোরে পড়ে শুনাচ্ছিলেন যেমন সামনে উঁচু পাহাড় সাবধানে চলতে হবে, বান্দরবনে অনেক উপজাতির মানুষের বসবাস ইত্যাদি ইত্যাদি। বান্দরবনের প্রায় সব জায়গায়ই একটাই শ্লোগান, সম্প্রীতির বান্দরবন। বান্দরবনে প্রায় আট থেকে দশ রকম উপজাতির লোকেদের একসাথে বসবাস। বাঙালী, চাকমা, চাক, মুরং, খেয়ং, মারমা, বম, খুমী, তঞ্চঙ্গ্যা, লুসাই, পাংখোয়া, ত্রিপুরা, ম্রো, এতগুলো সম্প্রদায়ের লোক একসাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে যা কিনা প্রশংসণীয়।

যাত্রার কিছুক্ষণ পর থেকেই শুরু হল কঠিন বন্ধুর পথ। অসম্ভব উঁচুতে উঠতে হচ্ছে আবার সে রকম ভাবেই ঢালে নেমে যেতে হচ্ছে। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম আমাদের সঙ্গে থাকা মাইক্রোবাস নিয়েই চলে যাবো। কিন্তু পরে আমরা সিদ্ধান্ত বদল করে

চান্দের গাড়িতেই যাওয়ার মনস্থ করেছিলাম। ওখানে এই ল্যান্ড ক্রুজারকে এলাকাবাসিরা চান্দের গাড়িই বলে। যাত্রার প্রথম অবস্থায় বাচ্চারা খুব মজা পাচ্ছিল কিন্তু যতই উপরে উঠছিলাম ওরা ততই ভয় পাচ্ছিল। আসলে বাচ্চাদের কি বলব আমি নিজেই খুব ভয় পাচ্ছিলাম যখন দেখছিলাম ডানে কিংবা বায়ে গহিন খাদ। আল্লাহ না করুক কোন কারণে যদি ড্রাইভার ব্রেক ফেল করে তাহলে সোজা উপরে আল্লার কাছে চলে যাবো। আমাদের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবেনা। রাস্তাটা ছিল সর্পিল, কিন্তু অনেক খাড়া। গাড়ি চলছিল খুব দ্রুত গতিতে। আসলে স্পীড বেশি না হলে এত উঁচুতে উঠাও যেতনা। খোলা জিপের পিছনে বসার সুবাদে আমাদের প্রচুর ঝাঁকুনি সহ্য করতে হয়েছে। আমারতো মনে হয়েছে যেন প্রাকৃতিক রোলার কোষ্টার এ চড়েছি। ভয়ে আমরা মেয়েরা হাত ধরে বসে ছিলাম। ছাদ খোলা থাকার ফলে ফেলে আসা পেছনের রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছিলাম আর ভয় পাচ্ছিলাম এ ভেবে যে এত উপরে উঠে গেছি। সেখানে প্রচুর বাতাস ছিল এবং বাতাসটা এসির বাতাসের থেকেও ঠান্ডা ছিল।

যাহোক, এক সময় এই শ্বাসরুদ্ধকর যাত্রাটা শেষ হলো। গাড়িটা এসে থামার সাথে সাথেই আমাদের সব কষ্ট নিমীষেই দুর হয়ে গেল সৃষ্টিকর্তার অপরূপ সৃষ্টি দেখে। চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। এত অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করা আমার মত সাধারণ মানুষের পক্ষে খুবই কঠিন কাজ। একমাত্র কবি সাহিত্যিকেরাই হয়তো পারবেন এটার সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে। তারপরও কিছুটা লেখার চেষ্টা করছি। চারদিকে সুউচ্চ পাহাড় সারি। বেশ অনেকটা দুর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে শঙ্খ নদী। ওটাযে নদী সেটা পরে জেনেছি। প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো ওটাও কোন আঁকাবাঁকা রাস্তা হবে। আর রয়েছে দিগন্ত জুড়ে নীল আকাশ আর আকাশটা যেন আমাদের নাগালের মধ্যেই আছে। যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। নীলগিরির সর্বোচ্চ উঁচুস্থানে রয়েছে আধুনিক ও সুদৃশ্য একটি রেস্টুরেন্ট। যদিও আমাদের জন্য একটা ডুপ্লেক্স কটেজ বুকিং করা ছিল, তারপরেও আমরা প্রথমে রেস্টুরেন্টেই ঢুকলাম। চারিদিকে কাঁচঘেরা থাকায় ওখানে বসেই প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। একদিকে জানালার পাশে চেয়ার টেনে বসে সামনের দিকে তাকাতেই দেখলাম দুরে গাঢ় সবুজের মাঝখানে একটি সাদা বৃত্ত। পরে জানতে পারলাম ওটা হচ্ছে হেলিপ্যাড। ঐ হেলিপ্যাডটি শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার উঠা নামার জন্য নির্মীত। আমার বোন এবং বাচ্চারা প্রচন্ড রোদকে উপেক্ষা করে দৌড়ে সেখানে চলে গেল আরও ভালভাবে দেখার জন্য। আমাদের জন্য নির্ধারিত কটেজ রেডি হতে আরও ঘন্টাখানেক সময় লেগেছিল এবং ঐ সময়টুকু আমরা রেস্টুরেন্টে বসেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। কটেজ রেডি হলে আমরা কটেজে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। আমাদের কটেজটা ছিল একটা টিলার উপর যার ডানে, বামে এবং পিছনে গহীন খাদ। বেশ লম্বা একটা খাড়া সিঁড়ি বেয়ে নেমে কটেজে যেতে হয়। সিঁড়িগুলোর দুই পার্শ্বে স্টিলের পাইপ দিয়ে মজবুত করে বাঁধা যাতে করে কেউ পড়ে না যায়। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় নীচে তাকালে ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে ভয়ের কোন ছিটেফোঁটাও ছিল না। ওরা সেই খাড়া সিঁড়ি বেয়ে বার বার দৌড়ে উঠানামা করছিল। সবাই শুয়ে বসে গল্প করছিল, এই ফাঁকে আমি বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম আমাদের সাথের সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটা প্রফেশনাল মডেলদের মত বিভিন্নভাবে ছবির পোজ দিচ্ছে এবং আমাদের একজন খুব যত্ন সহকারে ওর ছবিগুলো ক্যামেরা বন্দি করছে। অন্য ট্যুরিষ্টরাও ওর বিভিন্ন পোজের ছবি তুলেছে। দুপুরে লাঞ্চ করতে রেষ্টুরেন্টে গেলাম। লাঞ্চ করতে করতেই দেখছিলাম আকাশটা কালো মেঘে ঢেকে যাচ্ছে। খাওয়া শেষ করে যখন বাইরে বের হলাম তখন সাদা তুলার মতো মেঘ আমাদের গায়ে মাথায় পড়তে লাগলো। সে এক অন্যরকম অনুভূতি এবং অসম্ভব সুন্দর দৃশ্য। এখানে আসার আগে শুনেছিলাম নীলগিরিতে নাকি মেঘ ছোঁয়া যায় কিন্তু তখন বিশ্বাস করিনি, বাস্তবে দেখলাম আসলেই মেঘ স্পর্শ করা যায়। বেশ কিছুক্ষণ চলল প্রকৃতির এই খেলা এবং এর পরে নামল ঝমঝম বৃষ্টি। সবাই দৌড়ে রুমে ঢুকে পড়লাম, কিছুক্ষণ পরেই বৃষ্টি থেমে গেল। এবার ফেরার পালা। যদিও আমাদের রাত্রি যাপনেরও অনুমতি ছিল কিন্তু পরের দিন হরতাল থাকার কারণে আমরা বিকাল চারটার দিকেই ফিরতি পথে চলা শুরু করলাম। সাথে করে নিয়ে এলাম এমন কিছু চমৎকার স্মৃতি যা কিনা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কিছু স্মৃতির অন্যতম।

সফ্‌টি

নিলুফা আকতার (তিমু)
সিনিয়র এক্সিকিউটিভ (ওয়েলফেয়ার এন্ড কমপ্লায়েন্স)
অবনী নিট ওয়্যার লিমিটেড

আমি ব্যাবিলন গ্রুপে যোগ দেই ২০১০ইং সালের ১৭ই এপ্রিল। তখন থেকেই অবনী নীট ওয়্যার লিঃ এ কর্মরত। আমার কাজ মূলত শ্রমিকদের নিয়ে। শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা, সুযোগ-সুবিধা দেখা এবং বিভিন্ন ট্রেনিং এর মাধ্যমে তাদের সচেতন করা, কর্মস্থলের পরিবেশ সুন্দর করা ও কমপ্লায়েন্স ঠিক রাখা। এরমধ্যে একদিন আমাদের ফ্যাক্টরীর মেডিকেল অফিসার ডাঃ জান্নাতুন নাহার আমাকে ডেকে বলেন, একটা বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করব। আমি চিন্তা করলাম হয়তো শ্রমিকদের কোন বিষয়ে সমস্যা হয়েছে। আমি উনার কাছে গেলাম। আমি ভীষণ আনন্দিত ও উৎফুল্ল হলাম, এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো যা একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা। তিনি মেয়েদের স্যানিটারী ন্যাপকিন নিয়ে আমার কাছে পরামর্শ চাইলেন। এখানে কি মেয়ে শ্রমিকরা এ বিষয়টা সহজভাবে নিবে? আমি বললাম, এটা না নেওয়ার কিছু নেই, হাতের কাছে রয়েছে অথচ হয়তো কেউ জানেইনা এটার সম্পর্কে। আমাদেরকে তাদের বুঝাতে হবে। তারপর ডাঃ জান্নাতুন নাহার আমাকে বলেন, একটি মেয়ে দিবেন যে খুব সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারে। আমি জানতে চাইলাম, কেন? উনি জানালেন ০৫.০৩.২০১২ইং তারিখে স্যানিটারী ন্যাপকিন এর (সফ্‌টি) উদ্বোধন হবে। সেখানে মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে থেকে একজন কথা বললে ভাল হবে। আমি এ বিষয়টি জাহাঙ্গীর স্যারকে জানাই। তিনি বললেন, আপনার পছন্দমত কাউকে নিয়ে নেন। আমি সাথে সাথে খুঁজতে বের হয়ে গেলাম কাকে দেয়া যায়। অবশেষে মাথায় আসল সিনিয়র অপারেটর FIRST AID এর সদস্য রত্নার কথা। ওকে দেয়া যায়। মেয়েটি দেখতেও বেশ সুন্দর। তাকে আমি মেডিক্যাল সেন্টারে নিয়ে যাই। তার সঙ্গে জান্নাত ম্যাডাম কথা বলেন, তাকে বুঝান স্যানিটারী ন্যাপকিন সম্পর্কে। এ বিষয়ে সে বেশ কয়েকদিনের মধ্যে বুঝে নেয়, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কিভাবে কথা বলবে, কি কথা বলবে। ০৫.০৩.২০১১ইং তারিখে স্যানিটারী ন্যাপকিন এর উদ্বোধন হয়। আমি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যাই। ব্যাবিলন মেডিক্যাল সার্ভিসেস এর পাশে এটার ফ্যাক্টরী। বেশ সুন্দর জায়গা। ফ্যাক্টরীর কোল ঘেষে একটি পুকুর, বেশ চমৎকার দৃশ্য। যাইহোক, উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আমরা সবাই মিলে অতিথিদেরকে স্বাগত জানাই ফুল দিয়ে, ব্যাবিলন গ্রুপের পক্ষ থেকে সালাম স্যার, এমদাদ স্যার স্যানিটারী ন্যাপকিনের প্রজেক্ট দেখান। আমন্ত্রিত অতিথিগণ সবাই বক্তব্য রাখেন। আমাদের কর্মী রত্না কথা বলে, তার সাহস ও প্রতিভা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। এতো সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলেছে মনে হয়েছিল আমিও ওর মত করে পারবনা এতো লোকজনের সামনে। আমাদের মাননীয় পরিচালক এমদাদ স্যার যখন বক্তব্য রাখেন তখন এক পর্যায়ে একজনের প্রশংসা করেন, যে কিনা এই স্যানিটারী ন্যাপকিনের নাম দিয়েছেন 'সফ্‌টি'। তিনি মেডিক্যাল সার্ভিসেস এর মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ আসমা আক্তার। সফ্‌টি উদ্বোধন শেষ, যে যার কাজে ফিরে গেলাম। তারপরের দিন সকালে অফিসে আসি। রিসিপশন থেকে জানানো হলো, শাহ আলম স্যার আমাকে ডাকছেন। রুমে আমি একটু ভয়ে ভয়ে যাচ্ছি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনা, সেখানে আছেন আনিস স্যার ও জাহাঙ্গীর স্যার। আমার সাথে ওনারা কথা বলেন এবং দায়িত্ব দেন, এখন থেকে 'সফ্‌টি' নিয়ে আপনি এবং আপনার সহকর্মীরা মিলে শ্রমিকদের সচেতন করবেন। আমার কাছে ভাল লাগল যে আমার কাজের পাশাপাশি এমন একটি কাজ পেয়েছি। আমাদের মেয়ে স্টাফদের ডাকি, তাদের সাথে এ বিষয়ে কথা বলি। সবাই এ নিয়ে বেশ আগ্রহ দেখান। আমরা সবাই মিলে সফ্‌টি নিয়ে কার্যক্রম শুরু করি। আলোচনা সেমিনারের মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে সচেতন করা হয়, সফ্‌টি ব্যবহারের উপকার সম্পর্কে বিশেষ করে মাসিক এর সময় সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় মেয়েরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

প্রতিদিন অনেক মেয়ে শ্রমিক মেডিক্যাল সার্ভিসেস এ আসে হাজারো সমস্যা নিয়ে। এর মধ্যে মাসিক এর সময় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন না করার ফলে অনেকের অনেক রকম সমস্যা হচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন মেয়েদের স্বাস্থ্যহানী ঘটছে অপরদিকে মূল্যবান অর্থ অপচয় হচ্ছে। এ বিষয়ে সচেতন হলে মাসিক এর সময় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে মেয়েরা অনেক রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে।

এরমধ্যে একদিন খুব কম বয়সী ছাত্রী ভারতীয় একটি মেয়ে 'আর্তি' ফ্যাক্টরীতে মেয়ে শ্রমিকদের সাথে কথা বলার জন্য আসেন এবং সফ্টির উপকারীতা বিষয়ে দীর্ঘসময় কথা বলেন।

এ সমস্ত কর্মকান্ড চলাকালীন সময়ে সফ্টির দায়িত্ব নিলেন হাসান স্যার, শামীম স্যার, শাহ আলম স্যারসহ অনেকেই। এর মধ্যে মেইল এ জানতে পারলাম, সফ্টির পুরো দায়িত্বটা এককভাবে শামীম স্যারকে দেওয়া হয়েছে। এমদাদ স্যার, শামীম স্যার এবং ডাক্তারদের উপস্থিতিতে ফ্যাক্টরীতে একের পর এক সচেতনতামূলক আলোচনা সভা হতে থাকলো। এরই মধ্যে একদিন শামীম স্যার এর সাথে তেতুলঝোঁড়া স্কুলে গেলাম স্কুলের মেয়েদেরকে সফ্টি ব্যবহারের উপকারীতা সম্পর্কে জানাতে। সেখানে আমাদের পরিচালকরা ঐ স্কুলে একটি সুন্দর লাইব্রেরী করে দিয়েছেন। ঐ লাইব্রেরীর মধ্যে আমরা ৮ম, ৯ম, ১০ম শ্রেণীর মেয়েদের নিয়ে সফ্টি বিষয়ে আলোচনা সভা করলাম। সে আলোচনা সভায় প্রধান শিক্ষকসহ মহিলা শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। আমাদের আলোচনার মধ্যে দিয়ে মেয়েরা সফ্টি ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে উঠল। তখন থেকে ঐ স্কুলে মেয়েরা সফ্টি ব্যবহার করে। স্কুল ও ব্যাবিলন ফ্যাক্টরী ছাড়াও অন্যান্য বেশ কিছু ফ্যাক্টরীতে ও স্থানীয় ফার্মেসীগুলোতে প্রচারণা শুরু হলো। এ প্রচারণায় আমি, শাপলা ও অন্যান্য ওয়েলফেয়ার অফিসার শামীম স্যারের সাথে অংশ নিতে থাকলাম।

২০শে ফেব্রুয়ারী ২০১২ আমাদের ফ্যাক্টরীর পিকনিক হবে। পিকনিকে ফ্যাশন শো এর জন্য কয়েকজন মেয়েকে বাছাই করা হল। এর মধ্যে একটি মেয়েকে তার পরিবার ফ্যাশন শো এর অনুমতি দিচ্ছিলনা। আমি এবং শিমু মেয়েটির বাড়ীতে যাই এবং অনেকভাবে তাদের বুঝাই। পরবর্তীতে মেয়েটি ফ্যাশন শো করার অনুমতি পায়। আলাপ আলোচনার এক ফাঁকে মেয়েটির মায়ের কাছে সফ্টির কথাও তুলি, উনি সফ্টির ব্যবহার সমর্থন করলেন এবং অন্যদেরকেও বুঝাবেন বলে আশ্বাস দিলেন। এক পর্যায়ে এসে ফ্যাক্টরীতে গিয়ে সচেতন করার কাজটা কঠিন হয়ে দাঁড়াল, এই সময়ে এমদাদ স্যারের পরামর্শে শামিম স্যার সফ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি তথ্য নাটিকা করার উদ্যোগ নিলেন। ফ্যাক্টরীর ছেলেমেয়েদের বাছাই করে বেশ কিছুদিন তাদেরকে নিয়ে তথ্য নাটিকার মহড়া চলল এবং কয়েকদিন ব্যাবিলন এর মিরপুর জোন এ শুটিং হলো। এর মধ্যে একদিন হরিনধরার একটি বাড়ীতে আউটডোরে শুটিং হলে, মেয়েদেরকে শামিম স্যার বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। মনের মত শুটিংটা শেষ করলেন বলে আমার কাছে মনে হয়েছিল।

সফ্টির কর্মকান্ডে ফ্যাক্টরীর ম্যানেজমেন্ট, এইচ আর ডি, ওয়েলফেয়ার, মেডিক্যাল টিমের সদস্যরাসহ অনেকেই আমাকে অনেকভাবে সহযোগীতা করেছেন। আমার জানামতে ব্যাবিলন গ্রুপ ছাড়াও অন্য কয়েকটি ফ্যাক্টরী, তেতুলঝোঁড়া স্কুলের মেয়েরা ও আশেপাশের সাধারণ মহিলারাও সফ্টি ব্যবহারে উপকৃত হচ্ছে। একদিকে যেমন স্বাস্থ্য রক্ষা হচ্ছে অন্যদিকে অর্থের অপচয়ও বন্ধ হয়েছে। এরকম জনকল্যাণকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ব্যাবিলন গ্রুপকে ধন্যবাদ।

তোমাকে ভালোবাসি

শওকত আলী
সুপারভাইজার (কিউ সি), সেন্ট্রাল ষ্টোর
অবনী নিট ওয়্যার লিমিটেড

তুমি আমাদের প্রাণের ব্যাবিলন, তুমি আমাদের হৃদয়ের ব্যাবিলন
তুমি আমাদের জীবনের আলোক দিশারী পাঞ্জেরীর মত ।
তুমি আরও বল, আমি চির অনন্ত সৃজনশীল ও প্রগতিশীল
তাইতো আমরা তোমাকে ভালোবাসি ।
জন্ম ক্লান্তিলগ্নে তোমার জরাজীর্ণ ভঙ্গুর দেহকে পূণর্গঠিত করেছো ইস্পাতের মত ।
আর বেকার কর্মঠ মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছো কর্মসংস্থান ।
পূরণ করেছো তাদের মৌলিক চাহিদা
তোমার নাম ও যশ যেমন পৌঁছেছে উচ্চ শিখরে, তেমনি আমাদের বেড়েছে সম্মান ।
তোমার গৌরবে আমরা গর্বিত, তোমার দুঃখে আমরা দুঃখিত ।
তাইতো আমরা তোমাকে ভালোবাসি ।
রোম শহর যেমন একদিনে সৃষ্টি হয়নি,
তেমনি তোমার রাজ্য একদিনেই সৃষ্টি করনি ।
তোমার ভিশন মিশন এগিয়ে গেছে বহুদুর ।
আজ আমরা যাযাবর নই, মরুভূমির বেদনার বালুচরে নেই
তোমার রাজ্যে সবুজ মাঠে, আমরা আজ সোনালী শস্য পাচ্ছি ।
তাইতো আমরা তোমাকে ভালোবাসি ।
তোমার ভিশন মিশন গোপন প্রিয়ার মত ছল করে তাকিয়ে থাকার নয়
তাই, তোমাকে কখনো দেখেছি বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে,
কখনো দেখেছি শীতার্ত বস্ত্রহীন মানুষকে বস্ত্র প্রদান করতে ।
আবার কখনো দেখেছি রক্তদান কর্মসূচী ক্যাম্পে ।
সত্যিই তোমার তুলনা তুমি
তাইতো আমরা তোমাকে ভালোবাসি ।

আজব ঢাকা

মৌমিতা
সিনিয়র অপারেটর
ব্যাবিলন ড্রেসেস লিমিটেড

যানজটের এই ঢাকা শহর
রাত দিন মশার বহর
এখানে সেখানে আবর্জনা
ফেলছে সবাই নেই মানা
কালো ধোঁয়ায় যায় জীবন ।

এই শহরে ছুটছে সবাই
কেউ করে চাকরি
কেউবা করে দালালী
আবার কেউবা বেচে পানি ।

কেউবা আবার ফুলওয়ালী
লোড শেডিং তো সঙ্গী সবার
এমন সঙ্গী জুড়ি নেই যার
একদিন তার দেখা না পেলে
ঢাকা শহর ঘুমে ঢুলে
তবু সবাই ঢাকায় আসে ।

বিষাক্ত বাতাস নেয় নিঃশ্বাসে ।
ছিনতাই রাহাজানী হত্যা ও গুম
হচ্ছে প্রতিদিন কেড়ে নিয়ে সবার ঘুম ।

সন্ত্রাসীরা ঘুরে বেড়ায়
বুক ফুলিয়ে হেটে চলে যায়
বলবে কিছু সাহস নেই কারো
ঢাকা শহর আজব বড় ।

সন্ধ্যারাগে বাজে

এমদাদুল ইসলাম
পরিচালক
ব্যাবিলন গ্রুপ

বাজারে যাওয়া আসার পথে চৌধুরীদের বাড়ির সামনে একবার না দাঁড়িয়ে পারে না রাবেয়া। প্রতিদিনই সুযোগ মেলে তার বিশাল প্রাচীর ঘেরা বাড়িটার লোহার গেটের সামনে একবার থমকে যেতে। কত জাতের গাছই না লাগিয়েছে চৌধুরীরা তাদের বাড়ির সামনে ছেড়ে রাখা জায়গায়! জানা অজানা হাজারো জাতের ফুল লতা ও বাহারী সব গাছের মেলা সেখানে। মুগ্ধ চোখে দেখে সেগুলো রাবেয়া। বিচিত্র বর্ণ-আকার-প্রকারের যত ফুল, চোখ জুড়ানো পাতা বাহার, লাল-নীল-বেগুনী-রঙের ফুলে ছাওয়া লতা পাতা। গেটের বাইরে থেকে যতদূর চোখ যায় রাবেয়ার ততদূর এসবই দেখতে পায় সে।

নানি আর মার সাথে বস্তিতে থাকে রাবেয়া। বড় লোকদের শখের সাথে বস্তি বালিকার শখের মিল কেন হবে এটা ভেবে কূল পায়না রাবেয়া নিজেও। অবাক হলেও করার কিছু নেই-ভাবে সে। গাছ-পালা, ফুল-ফল, লতাপাতা, রঙিন কীট-পতঙ্গ তার একটু বেশিই ভালো লাগে।

বাবা তার মাকে ছেড়ে গেছে সে যখন দু'বছরের শিশু। বাবাকে তার মোটেও মনে পড়ে না। এখন বার বছরের রাবেয়ার সংসারে মা আর প্রৌঢ়া নানী ছাড়া আর কেউ নেই। বস্তির সমবয়সীদের সাথে খেলা-ধুলা, সকালে নিয়ম করে বাজারে যাওয়া, চুরি করে এখান ওখান থেকে এটা সেটা হাতিয়ে আনা, আর মা, নানীকে ঘরের কাজে টুকিটাকি সাহায্য করা- সব মিলে এই হলো রাবেয়ার জীবন-যাত্রা। স্কুলে যাবার প্রশ্ন ওঠেনি কখনো।

বাজারে যেতে হয় সপ্তাহে সাত দিনই। বাজারের মুখে লাইন করে বসে থাকা অন্যান্য ভিখিরিদের সাথে সেও বসে যায়। ক'টা পয়সা জুটে গেলে আর দেরী করে না সে। সবজি-মাছ বাজারে ঘোরাঘুরি করে। পয়সা দিয়ে কিছু কেনা আর চেয়ে চিন্তে বাকিটা- তারপর বাড়ির পথ। কিন্তু সরাসরি বাড়ি যাবে না সে। আবার দাঁড়াবে এসে চৌধুরীদের গেটে। চৌধুরীদের বাড়ির লোকদের খুব একটা দেখতে পায়না রাবেয়া। এরা দামী গাড়ি চেপে যাওয়া-আসা করে। দারোয়ান গেট খুলে দেয়-বন্ধ করে দেয়।

পুলিশের পোশাকে দারোয়ান লোকটা খারাপ নয়। বাড়ির লোক ও কেরামত মিঞার দৃষ্টির আড়ালে থাকলে সে এক আধটা ফুল টুলও ছিড়ে দেয় কখনো কখনো। দারোয়ান মানুষটা যদি মোটামুটি ভালো হয় তো কেয়ারটেকার কেরামত মিঞা এক মহা হারামী-ভাবে রাবেয়া। মানুষ এতো নির্দয় হতে পারে? ওদের এতো গাছ এত ফুল-ফল-গাছ তলায় ছড়িয়ে থাকে, পঁচে যায়। তবু লোকটার দিলে একটু মায়া হয় না রাবেয়ার মত একটা অভাবী মেয়ের জন্য। রাবেয়ার যে ওদের বাগানের সব গাছ, ঘাস, লতা, পাতা, ফুল-ফল ভীষণ পছন্দ তা লোকটা মোটেও বুঝতে পারে না। আচ্ছা ও কি কখনো আমার মত ছোট ছিল না? তখন পরের বাড়ি থেকে ফুল চুরি করেনি কখনো? এসব ভেবে কেরামত মিঞার উপর রাগ অভিমান আরো বেড়ে যায় রাবেয়ার।

ভেতরে দুরের কথা, ওকে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেই তেড়ে আসে কেরামত মিঞা। অকথ্য গালি-গালাজ করে

তাকে। তখন দারোয়ানও বাদ যায় না।
'হারামজাদী, ফকিরনির মাইয়া- আর যদি তোরে এইখানে--------' অনেক আজে বাজে গালি বকে হারামী লোকটা। দৌড়ে পালাতে পালাতে চোখে পানি চলে আসে তার। বাড়ির পথে হাঁটতে হাঁটতে অভিশাপ দেয় সে কেয়ারটেকারকে।

চৌধুরীদের বাগানটা অনেক বড়। বাড়ির সামনের দিকটায় নানা জাতের দেশী-বিদেশী ফুল গাছ, ফুল ফোটেনা অথচ দেখতে সুন্দর ধরনের কত রকম ঝোপ ঝোপ গাছ। বাড়ির পেছনের দিকটায় বিশাল জায়গা জুড়ে রকমারী ফলের গাছ। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, জামরুল, আতা, পেয়ারা, সফেদা, নারকেল, তেঁতুল--- কিছুই যেন বাদ নেই। পুরো বাগান বেশ ক'বার দেখা হয়ে গেছে রাবেয়ার। দারোয়ান ভাই সুযোগ করে দিয়েছিলো চৌধুরীরা যখন কেউ বাড়িতে নেই সেই রকম সময়ে। চৌধুরীরা কেউ বাড়িতে না থাকলে তখন কেরামত মিঞাও কাজে ফাঁকি দেয়। সে তখন আরাম করে ঘুমায় তার রুমে। শেষবার অবশ্য অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিল রাবেয়া। জামরুল তলার ছড়িয়ে থাকা জামরুল কুড়িয়ে মন ভরেনি তার। লোভ করে গাছে উঠে পড়েছিল সে। এক সময় ডাল ভেঙে সশব্দে পতন। হালকা শরীরে ঘাসের উপর পতনের ধাক্কা তেমন কিছু ছিল না। নিজেকে সামলে নিয়ে জামরুলগুলো কুড়িয়ে মলিন ফ্রকের প্রান্ত উল্টে ভরছিল যখন তখন হা হা করে ছুটে আসছিল সদ্য ঘুম ভেঙে যাওয়া কেরামত মিঞা। পরনের লুঙ্গির আলগা হয়ে যাওয়া গিট বাঁধতে না হলে রাবেয়া হয়তো ধরা পড়েই যেত সেদিন। ক্ষিপ্র হরিণ ছানার মত বাগানের পেছনের দিকে পাচিলের সরু এক ভাঙা গলে পালিয়ে বেঁচেছিল রাবেয়া সেই যাত্রা। ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে সেদিন রাবেয়া প্রতিজ্ঞা করেছিল যে আর কখনো সে ও বাড়িমুখো হবে না। পরের দিনই অবশ্য সেই প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়েছিল সে। গাঢ় সবুজ দুই পাতার মাঝখানে মোটাসোটা এক বেলী ফুল বৃন্ত থেকে তুলে এনে সে যখন মার হাতে দেয় তখন তার চোখ-মুখে আনন্দের ঝিলিকটা রাবেয়ার অদেখা থাকেনা। মার ঐ আনন্দ অভিব্যক্তি রাবেয়ার কচি হৃদয়ে একটা তৃপ্তি ও ভাললাগার দোলা দিয়ে যায়। চৌধুরীদের বাগান থেকে কুড়িয়ে আনা পুষ্ট একটা জামরুল তার নানীকে এনে দিলে তার চোখ-মুখ বাচ্চাদের মতই খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে যায়। নানীর সেই উদ্ভাসিত মুখচ্ছবি দেখে বস্তি কন্যা রাবেয়া অন্তরে ক্ষণিকের জন্য যেন রাজেশ্বরী হয়ে ওঠে। কাজেই কেরামত মিঞার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ফিরে ফিরে সে ওখানে যাবে এ আর আশ্চর্য কি?

কিন্তু কেয়ারটেকার কেরামত মিঞারই বা দোষ কি? বস্তির ঐ চোরনির কোন ধারণাই নেই তার জন্য কি পরিমাণ হেনস্থা হতে হয় তাকে চৌধুরী বাড়ির গিন্নি আর তাদের একমাত্র আদরের কন্যার কাছ থেকে। মিসেস চৌধুরী বা খালাম্মার কাছে বকা খেয়ে তার তেমন কষ্ট হয়না। কিন্তু তার নিজের মেয়ের বয়সী মেয়ে অহনা যখন তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে তখন নিভৃতে চোখে পানি ধরে রাখতে পারে না সে।

অহনা কি করে যেন সব অঘটন টের পেয়ে যায়। রাবেয়া তাদের বাগানের একটা পাতা ছিড়লেও সে কিভাবে যেন তা জেনে যায়। তারপর সেই পিচ্চি মেয়ে নিয়ে পড়ে কেরামত মিঞাকে। বাগানের ফুল-ফল ধরে রাখতে পারে না এমন কেয়ারটেকার ঘরে পুষে লাভ কি? বুড়োকে বিদেয় করে যোগ্য কাউকে কেন নেয়া হয়না- চিৎকার করে এসব প্রশ্ন তুলে মার সাথে ঝগড়া করে সে। মিসেস চৌধুরী কখনও মেয়েকে বোঝানোর চেষ্টা করেন আবার কখনোবা মেয়ের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তাকেই বকেন।

সেবার টক বরই পেকেছে বাড়ির পেছনের বাগানে। রাবেয়া কখন কিভাবে বাড়িতে ঢুকেছে কেউ টের পায়নি। তলারটা কুড়িয়ে রাবেয়া উপরের দিকে তাকায়। ডালে ডালে পাকা ডুমুরের মত থোকায় থোকায় বরই পেকে আছে দেখতে পায়। প্রথমে গাছের কান্ড ধরে ঝাঁকায় সে। তার অপুষ্ট জীর্ণ শরীরে কিইবা আর শক্তি। কাজেই আশপাশ থেকে ঢিল কুড়িয়ে বরই ডালে ছুড়ে মারা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না রাবেয়ার। টুপ টুপ করে পড়তে থাকে কাঁচা পাকা বরই। দ্বিগুণ উৎসাহে ঢিল ছুড়তে থাকে রাবেয়া। চৌধুরী বাড়ির মেয়ে অহনা কখন চুপিসারে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি সে একটুও। আচমকা চুলের মুঠিতে প্রচন্ড টান পড়ে রাবেয়ার। প্রচন্ড ঝাঁকিতে মাটিতে পড়ে যায় সে। ধনী-কন্যা অহনার শরীরে শক্তির কমতি নেই কোন। তড়াক করে উঠে দাঁড়ায় রাবেয়া। ক্রোধ উন্মাদ অহনার জ্বলন্ত দৃষ্টির দিকে এক মুহূর্তের বেশি তাকাতে পারে না বস্তির মেয়ে রাবেয়া। বরই-এর মায়া ত্যাগ করে সে। ত্রস্তে ছুটে পালায় প্রাচীরের ছোট্ট ফোকড় গলে।

অহনা সেদিনই এক রকম বের করে দিয়েছিলো কেরামত মিঞাকে। বুড়ো-ধাড়ি বলে বকা-ঝকা অহনার কচি মুখে একটুও আটকায়নি। সেদিনও মিসেস চৌধুরীর জন্য চাকরিটা বেঁচে গিয়েছিলো তার। তবে রক্ষা পায়নি গেটের দারোয়ান ওসমান। তাৎক্ষনিক বিদায় নিতে হয়েছিলো তাকে।

এই বুড়ো বয়সে উপায় থাকলে কবেই চলে যেত কেরামত মিঞা। বড় ছেলে এক দোকানে কাজ করে। বিয়েও করেছে। কষ্টে চলে। দুটো মেয়ের একটার বিয়ে হয়েছে। ছোটটা মার সাথে থাকে গ্রামের বাড়িতে। কেরামত মিঞার পাঠানো টাকায় চলে ঐ সংসার। এই অবস্থায় মান-অপমান বোধ প্রখর হলে চলে না কেরামত মিঞার।

মনিব, মনিব কন্যার দুর্ব্যবহার, অপমান সব সহ্যই করতে হয় তাকে মুখ বুজে। রাবেয়ার উৎপাত শুরু হওয়ার পর থেকে সব রাগ গিয়ে পড়ে ঐ চোরনি মেয়েটার উপর। বছর দুয়েক ধরে ঐ মেয়ের জন্যেই তার যত জ্বালা। ভাবে শয়তান মেয়েটাকে একবার ভালমতো কিছু উত্তম-মধ্যম দিতে পারলে ও আর এ মুখো হবে না। কেরামত মিঞাও বাঁচবে মালিক কন্যার দুর্ব্যবহার থেকে। সুযোগের অপেক্ষায় থাকে তাই কেরামত মিঞা। দারোয়ানটির সাহায্য পায় না সে। কেরামত মিঞা বুঝতে পারে দারোয়ানের মদত ছাড়া ঐ পুচ্চি মেয়ে বাগানে ঢুকতে পারার কথা নয়।

গত রাতে কালবোশেখির ঝড় হয়েছে খুব। চৌধুরীদের বাগানে কাঁচা আম, ঝুনো নারকেল সব পড়েছে অনেক। একটা কথা ভেবে কেরামত মিঞার মন খুশী খুশী হয়ে যায়। রাবেয়াকে শিক্ষা দেবার এমন মোক্ষম সুযোগ আর কখনো আসবেনা ভাবে সে। চোরনি রাবেয়া আম কুড়োবার এই লোভ কোনভাবেই সামলাতে পারবে না-এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় পাশ ফেরে কেয়ারটেকার।

দিনের আলো ফুটবার আগেই ফজরের নামাজ পড়ে তৈরি হয়ে থাকে কেরামত মিঞা। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে, চোরনির দেখা নেই। বেলা বাড়ে তাও রাবেয়ার পাত্তা-নেই। উৎকণ্ঠা বাড়ে কেরামত মিঞার, সাথে হতাশা। অন্য কোন বাড়িতে হানা দিয়েছে- ভাবে সে। ঝড়ে আম পড়েছে সব বাড়িতেই। মনটা বিষিয়ে যায় তার বদের হাড্ডি মেয়েটাকে শাস্তি দেবার একটা নিশ্চিত সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায়। যাহোক সুযোগ একদিন আসবেই ভেবে নিজেকে শান্তনা দেয় সে।

এরপর ঝড়-বিদ্ধস্ত বাগানটা ঘুরে দেখতে বেরিয়ে পড়ে সে।

-আপনের চুরনিতো কারেন্ট খাইয়া মরছে। শুনছেন চাচা? কাজের ছেলে বারেকের কথায় পত্রিকার পাতা থেকে চোখ তোলে কেরামত মিঞা।
-কি হইছে? কে মরছে কইলি?
-রাবেয়া। আপনার চুন্নী। কাইল ঝড়ে তাগো বস্তির চালে কারেন্টের তার ছিড়া পড়ছে...

বাকী কথা শুনতে শুনতে কেরামত মিঞা কেমন আনমনা হয়ে যায়।
একমাথা জট বাঁধা রুক্ষ চুলে ছিপছিপে প্রায় কুৎসিত কৃষ্ণকায় রাবেয়াকে মানসপটে দেখতে পায় সে। এক এক করে ভেসে ওঠে মনের পর্দায় চৌধুরীদের বাগানে ওর অসংখ্য চুরির কুকীর্তি। মনে পড়ে যায় খালাম্মা ও বাচ্চা মেয়ে অহনার কাছে তার অজস্রবার অপমানিত ও নিগৃহিত হবার কথা- ঐ রাবেয়ার জন্য। যাক, তাকে আর কিছু করতে হলো না। সব আল্লাই মিটিয়ে দিলেন। আর কখনো আসবেনা রাবেয়া চুরি করতে। দারুণ একটা স্বস্তির সংবাদ।

কিন্তু কেরামত মিঞা স্বস্তিটাকে ঠিক যেন ধরতে পারছে না মনের মধ্যে। জানালা গলে বাইরে বাগানের দিকে দৃষ্টি ফেলে সে। গতরাতে লন্ড ভন্ড হয়ে যাওয়া ফুল-ফলের বাগান তার কাছে কেমন ঝাপসা ঠেকে।

আপন-পর

এ,কে,এম, গোলাম মহ্‌হী চৌধুরী
সিনিয়র অফিসার, কমার্শিয়াল
ওভেন টপ্‌স, ব্যাবিলন গ্রুপ

ভাইসাহেব, একটা 'ট্রাগ-মেডি' কাহিনী শোনেন।

আমি সন্দিহান দৃষ্টিতে পাশের সিটে বসে থাকা লোকটার দিকে তাকালাম। লোকটাকে দেখে তো সন্দেহ হবার মত কিছু নেই। ভদ্রোচিত পোশাক। হালকা হলুদ রংয়ের শার্ট, কালো রংয়ের প্যান্ট। গায়ের রং ফর্সা। তাতে হলুদ শার্টে হালকা আভা পড়েছে।

কি ভাই শুনবেন ট্রাগ-মেডি গল্প ?

তার ফিরতি কথায় আমার ভাবনায় ছেদ পড়ল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, গল্প, এ পাবলিক বাসের চাপাচাপিতে! লোকটা মিষ্টি হেসে বলল, আরে ভাই এখান থেকে মিরপুর যেতে পাঁচটা সিগনাল পড়বে। খুব কম করে হলেও তো ঘন্টাখানেক লাগবে। ততক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বোর হওয়ার কী মানে আছে ? গল্প শুনুন, ট্রাগ-মেডি গল্প।

লোকটার কথা শুনে আমার থতমত অবস্থা। কিছুটা বিরক্তও হলাম বটে। গল্প শোনার বয়স অনেক আগে ফেলে এসেছি। তবু লোকটার আগ্রহে জল ঢালতে ইচ্ছে করল না কেন জানি। ট্রাগ-মেডি গল্প মানেটা ঠিক বুঝলাম না, বললাম।

সাধারণত বিয়োগান্তক বা দুঃখজনক গল্প হল ট্রাজেডি গল্প আর যে সব গল্পের HAPPY ENDING অর্থাৎ অত:পর তাহারা সুখে শান্তিতে বাস করিতে লাগিল টাইপের সেগুলো হল কমেডি গল্প। আমার গল্পে ট্রাজেডি ও কমেডি দুটোই আছে তাই 'ট্রাগ-মেডি' গল্প।

লোকটা প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে বলল।

লোকটার ছেলেমানুষি টাইপ কথায় আমার প্রায় হাসি পেয়ে যাচ্ছিল। CONTROL করলাম নিজেকে। অপরিচিত ব্যক্তির কথায় বেশি REACT করলে মাথায় চড়ে বসতে পারে। অতপর গল্প শুনলাম। গল্পটা কেমন মন্তব্য না করে হবহু তুলে দেয়াই বরং শ্রেয়।

আমি গোলাম মহ্‌হী চৌধুরী। বয়স পঞ্চাশ (এ বয়স শুনে আশ্চর্য হয়েছিলাম। আমি খুব বেশি হলে চল্লিশ ভেবেছিলাম) ব্যাবিলন গ্রুপের সিনিয়র কমার্শিয়াল অফিসার। তবে আমার পরিচয়টা গল্পের কোন অংশ নয়। গল্পের জন্য তা সহায়ক হবে। আমি মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে খুব STRUGGLE করে উঠে এসেছি। বাংলাদেশের প্রায় প্রতি একশ জনে ৭০ জন যুবক আমার মত STRUGGLE করে দাঁড়ায়। বিয়ে করেছি প্রায় ১৮ বছর। প্রত্যেকটা বিয়ে মানেই অসম্ভব সুন্দর কিছু স্বপ্ন আর প্রত্যাশার শুরু। আমার ক্ষেত্রে স্বপ্ন ও প্রত্যাশাগুলো একটু বেশীই গাঢ় ছিল মনে হয়।

আমি, আমার স্ত্রী প্রায়ই একটা স্বপ্ন দেখতাম। একটা ছোট ঘর, একটা ছোট্ট মুখ, আধো আধো কথা। একটা মানুষের সুখী হবার জন্যতো খুব বেশী কিছুর দরকার হয় না। BUT FATE HARDLY BORE SWEET FRUIT FOR US. বিয়ের পাঁচ বছর পরও আমরা নিঃসন্তান রয়ে গেলাম। স্বপ্ন ভাঙার শব্দ শুনেছেন কখনও ? খুব তীক্ষ্ণ, গাঢ় ঘুমও টুটে যায়। আমাদের স্বপ্নও ভেঙ্গে গেল। আমরা ডাক্তারের কাছে ছুটলাম। আমাদের কোন PROBLEM ছিল না। একজন স্পেশালিস্ট বললেন, হয়তো WOMB এ টিউমার থাকতে পারে। তবে বিদেশে এর ভাল TREATMENT আছে। ছুটলাম বিদেশে। আমার স্বল্প

আয়ে সঞ্চয় বলতে যা কিছু ছিল তা দিয়ে সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত চেষ্টা করলাম। আমার স্ত্রীর দুবার অপারেশনও হল। কিন্তু FRUITLESS, কিছুতেই কিছু হল না। মাঝে মাঝে জীবনটা অর্থহীন মনে হত। মরে যেতে ইচ্ছা করত। যুক্তিহীন সব পরামর্শ, চেষ্টা তদবীর এর দিকে ঝুঁকে পড়লাম। হয়তো কেউ বলল কোন পানি পড়া দিতে হবে, কিংবা তাবিজ/কবচ নিতে হবে। যে যা বলত তাই করতাম। একটা অতৃপ্ত বাসনা আমাকে কুঁকড়ে মারতে লাগল। আমার বৃদ্ধা মায়ের একটা শেষ ইচ্ছা ছিল – নাতী নাতনীর মুখ দেখে মরবেন। তিনিও বিদায় নিলেন। একসময় সব আশা ছেড়ে দিলাম। একটা স্বপ্নহীন প্রত্যাশাহীন জীবন যাপন করতে লাগলাম (গল্পের এ পর্যায়ে আমি মহী সাহেবের চোখের দিকে তাকালাম। তার চোখে মুখে অদ্ভুত একটা বিষন্নতা তারপর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস) এভাবে আরো দশ-এগার বছর কেটে গেল শুন্যতা আর আশাহীন দীর্ঘশ্বাস নিয়ে।

এরপর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো আমার জীবনে। আমার ছোটবোন আমাকে একদিন ফোন করল। সে কোথা থেকে যেন একটা বাচ্চা যোগাড় করেছে। সে চায় আমি যেন বাচ্চাটাকে লালন পালন করি। আসলে অন্য কারো বাচ্চা লালন পালনের কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না। আমি না বলে দিলাম। ও আবার ফোন করল, বলল, বাচ্চাটার জগতে কেউ নেই। মাত্র তিন দিন বয়স। মা জন্মদানকালেই মারা গেছে। বাবার খোঁজ নেই, ঋণের দায়ে পলাতক। ওর পিড়াপিড়িতে অবশেষে বাচ্চাটাকে দেখতে গেলাম। আমার জীবনের স্পর্শকাতর মুহূর্তগুলোর মধ্যে এ মুহূর্তটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমি আর আমার স্ত্রী বাচ্চাটার সামনে যাওয়ার পর ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম। একদম পরীর মত ফুটফুটে একটা মেয়ে। পরম করুনাময় মানুষকে বড় অদ্ভুত জীব হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। অন্য কোন জীব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। মানুষ করে অথচ মানুষের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হবার জন্য একটা মুহূর্তই যথেষ্ট।

নবজাতকের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার ভেতরটা একটা নাড়া দিল। আমার ভেতরের বাবাটা কেঁদে উঠল। আমার স্ত্রীরও আমার মত অবস্থা। আমরা বাচ্চাটাকে নিয়ে আসলাম। ওর চোখ দুটো ছিল টানা টানা। ঠোঁটজোড়া ছিল লালচে গোলাপী। খুব সম্ভবত রূপকথার গল্পের 'স্নো হোয়াইট' বাস্তব হয়ে যেন আমার ঘরে এসেছিল। আমাদের বুকটা ভরে গেল। কেন যেন মনে হতে লাগল **'আপন পর'** মানুষের মনগড়া ধারণা। মানুষ চাইলে একান্ত কাছের জনকেও একমুহূর্তে পর করে দিতে পারে, আবার নিতান্ত দুরের কাউকে হৃদয়ের গভীরতম স্থানে স্থান দিতে পারে।

যাইহোক, কয়েকদিন যে কী সুখে কাটল বলে বোঝাতে পারবোনা। বাচ্চাটাকে নিয়ে কত জল্পনা কল্পনা, কত যত্ন আত্তি। দুদিনেই বাচ্চাটাকে একদম আপন করে নিলাম। ভুলে গেলাম সে কে আর আমরা কে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে হয়তো দেখলাম কাঁথা ভিজিয়েছে, অমনি উঠে দৌড়ালাম। শুকনো কাঁথা এনে পরিষ্কার করে আবার শোয়ানো-আরো কত যে কাজ। আমার স্ত্রী আর আমার এক বিন্দু অবসর নেই। একটু কাঁদলেই অস্থির হয়ে পড়েছি। সারারাত কোলে তুলে নিয়ে হেটেছি। এভাবে কাটল ৬ দিন। তারপর হঠাৎ সপ্তম দিনে বাচ্চার অসুস্থতা দেখা দিল। বার বার খিঁচুনি, ঠোট কালো হয়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। কান্নার শক্তিটাও ছিলনা আমার যাদুটার। মাথার ওপর আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। (এ পর্যায়ে এসে মহি সাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হলাম। চোখে পানি টলমল করছে। এতক্ষণে গল্পের ঘটনা প্রবাহের সাথে কিছুটা হলেও আমি মিশে গেছি। তাই একটা আশু বিপদের আশংকা আমার মনকেও নাড়া দিল। গল্পের ক্লাইমেক্সে কী হয় কে জানে)। ডাক্তারের কাছে দৌড়ালাম আমরা। ডাক্তার পরীক্ষা করে শিশু হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললেন। আরো বললেন ও কিছুটা প্রি-ম্যাচিওর পিরিয়ডে জন্ম নিয়েছে হয়তো। তাই শরীরের সব ORGAN তখনও ঠিকমত ডেভেলাপ করেনি। ফুসফুসে ইনফেকশান দেখা দিয়েছে। আমার সোনামনিটাকে নিয়ে ছুটলাম শিশু হাসপাতালে। মনে আছে কত হাজার বার যে চুমু খেলাম ওর মুখে হাসপাতালে যেতে যেতে। শিশু হাসপাতালের ডাক্তারদের এক্সপ্রেশান দেখে আমার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল। তারা বাচ্চাটাকে ICU তে নিয়ে গেলো। একজন ডাক্তার একটা নিস্পৃহ দৃষ্টি নিয়ে আমাকে বললেন, একদম শেষ সময়ে নিয়ে এসেছেন।

পরের আটচল্লিশ ঘন্টা আমাদের কেমন কাটল তা বলে বোঝানো কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব না। হয়তো কেউ বলবে পরের বাচ্চার জন্য এত কেন ? ভুল। ও আমার, আমাদের সম্পূর্ণ অস্তিত্বে মিশে গিয়েছিল। যে আমার সকল অস্তিত্বে মিশে গিয়েছিল

তাকে পর বলি কীভাবে। আমি কত কিছু যে মানত করলাম। আমার স্ত্রী পুরো সময়টা ICU এর কাঁচের দেয়ালটার বাইরে দাঁড়িয়ে। আমরা একটা অশুভ প্রহরের অপেক্ষা করছিলাম। আটচল্লিশ ঘন্টা পর এল সেই অশুভ সন্ধ্যা। ICU থেকে ডাক্তাররা আমার সোনামনির মৃতদেহটা বের করে আনল। আঠার বছরের তৃষিত পিতার মনটা কিছুতেই কান্না থামাতে পারছিল না। নাখালপাড়ার একটা গোরস্থানে নিয়ে সেই ছোট্ট শরীরটাকে দাফন করে আসলাম। আমার মনে আছে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছিল তখন। সেই বৃষ্টির মধ্যেই ছোট লাশটা কবরে নামালাম। ভিজতে ভিজতে মাটি দিলাম।

পরম করুনাময়ের প্রতি সেদিন খুব অভিমান হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল মানুষের স্বপ্ন প্রত্যাশার শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নিতে তাঁর একটুও কষ্ট হয় না। (এ পর্যায়ে মহি সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনেই বুঝতে পারলাম তা কত গভীর বেদনা থেকে উঠে এসেছে। তার দুঃখ আমাকেও স্পর্শ করল কিনা জানিনা তবে চোখের কোনে এক ফোটা জল জমে ছিল আমার। আমি চমকে উঠলাম)

আমার গল্পের **ট্রাজিক** অংশের পরিসমাপ্তি এখানেই।

আমি জানিনা তবে মনে হয় সৃষ্টিকর্তা মাঝে মাঝে মানুষকে পরীক্ষা করেন। আমাকেও তিনি পরীক্ষা করেছিলেন। তা নয়তো কী ? এ ঘটনার মাস দুয়েক পরেই আমাদের জীবনে একটা মিরাকল ঘটল। আমার স্ত্রী কনসিভ করল। ততদিনে স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিয়েছি আমি। তাছাড়া আমার স্ত্রী আগেও কবার কনসিভ করেছিল। কিন্তু কোনবারই কিছু হয়নি। ডাক্তাররা বলেছিল ওগুলো আসলে টিউমার। যাইহোক যখন সন্তান প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসল তখনও একান্ত নিরাশ ছিলাম। শুধু পরমকরুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করছিলাম আমাকে যেন তিনি আর আশা না দেখান। এবার সত্যি সত্যি ১৭ বছর পরে আমাদের একটা অপূর্ব মেয়ে হল। একদম সুস্থ সবল। আমার বুকটা ভরে গেল। এখন আমার মেয়ের বয়স এক বছর। ও খুব ভাল আছে। ওর নাম, 'মার্শিয়া আল মান্হা (মাহী)'। অর্থ, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ উপহার।

এখন আমার সকালগুলো শুরু হয় স্বপ্নের মতই। আমার মেয়ে সকালে আধো আধো স্বরে বাবা, মা ডাকতে থাকে। তার আধো আধো বোল শুনে আমার ঘুম ভাঙে। ওর প্রতি গভীর স্নেহ আমাকে চালনা করে সুন্দর আগামীর প্রতি। ওর মুখের হাসি আমাকে প্রেরণা দেয়। আবার রাতে ঘরে ফিরি শুধু একটা প্রত্যাশায় আমার ছোট্ট সোনামনিটার মুখ দেখব বলে। আমার ঘরে ফেরার জন্য ও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। আমার **'কুন্টামানাকুনারঠানা'** কে বুকে নিয়ে রাতে ঘুমিয়ে পড়ি আমি।

পৃথিবীর সবচে সুখী মানুষ কে ? প্রশ্নটা কঠিন মনে হলেও আমার কাছে উত্তরটা একদম সহজ। পৃথিবীর সবচে সুখী মানুষ আমি। ভাবছেন হয়তো বাড়িয়ে বলছি কিংবা অভিনয় মেশানোর চেষ্টা করছি। মোটেও না। সুখ দুঃখ গণনার উর্দ্ধের ব্যাপার। তবে আমার ভেতরে যে অনুভুতির পাত্রটা আছে তা এক সময় শুণ্য হয়ে গিয়েছিল। এখন তাতে এক বিন্দু দুঃখ নেবার মত স্থানও শুণ্য নেই। আমার সোনামনির জন্য দোয়া করবেন ভাই। (এ কথা বলেই ভদ্রলোক উঠার জন্য তোড়জোড় শুরু করলেন। যাবার সময় মুচকি হেসে বললেন),

ভাই সামনেই মিরপুর দশ, ওখানেই আমাকে নামতে হবে। আবার দেখা হবে ভাই।

মহি সাহেবের সাথে আর দেখা হয়নি আমার তবে সত্যি বলতে কী ওনার **'ট্র্যা-মেডি'** গল্পটা আমার খারাপ লাগেনি।

মা কাঁদছে

মোঃ জোবায়দুল ইসলাম
সিনিয়র অফিসার
ব্যাবিলন ওয়াশিং লিমিটেড

(তারেক মাসুদের স্মরণে)

বাবা তারেক, কই গেলি বাবা! তোরা আমার তারেকরে
ফিরায়ে দে; কই গেলি বাবা-!
কিসে আমার ভাল হইবো, কিসে আমার মন্দ হইবো
সব সময় খেয়াল রাখতো।
দুনিয়ার যে দেশেই থাকুক নিয়ম কইরা আমারে ফোন দিত
চার্জ ছিলোনা; বাবা না জানি কতবার আমারে কল দিছিল;
একবার রিং বাজছিল, ধরতেই পারলাম না।
বাবা আমার শনিবার কাজ সাইরা বাড়িতে ফিরা আইবো।
ওর বাবার মিলাদের আয়োজন করবো। বাবারে কবর দিয়া
রাতের বেলা আমারে কইলো
: মাগো, আমারে বাবার পাশে কবর দিয়ো কিন্তু।
কইলাম, এসব কি কথা! আমি তোমারে কবর দিবো ক্যান
তুমি আমারে দিবা-।
সোনার টুকরা ছেলেরে তোমরাতো রাখতে পারলা না।

বাবা কাগজের ফুল বানাইবো। কত যে স্বপ্ন ছিল ওর।
মারে কত কথা কইতো, কিছুইতো শেষ কইরা যাইতে পারলো না।
যা কিছু করছে সব নিজে নিজে।
আমি তো অবাক হইয়া যাই। আমার ছেলে এতো বড় মানুষ!
আলমগীর কবীর চইল্যা গেছে সেই কবে।
তারেকের লগে মিশুক মুনীরও চইলা গ্যাল। অহন তাগো কি হইবো ?
অহন আমার ক্যাথরিন, সোনার পোলা নিষাদের কি হইবো ?

১২ বছর বয়সে আমার বিয়া হইয়া গ্যাল। ওর বাবাতো পরহেজগার
লোক ছিলেন। কোথাও বাইর হইতে পারতাম না। কেমনে-কেমনে
যে আমার সেই কষ্ট বুঝলো, জানি না। ও সেই গল্প দিয়া
ছবি বানাইলো 'সোনার বেড়ী'।
কত যে ছবি আমারে দেখাইছে। ছবি নিয়া তার কত যে গল্প।

'পথের পাঁচালী' দেখানোর সময় কইছিলো 'মা দ্যাখো এইখানে
দুর্গা কিন্তু মারা যাবে। তুমি কাঁদবানা।' আমারে কানতে না কইরা
ও নিজেই কান্দে- পাগলা আমার নিজেই কান্দে।

ওর বড় বোন আসমা যখন মরে, সেই কথা ও কেমনে ভুলবো।
চারদিকে পানি আর পানি, থৈ থৈ করে পানি।
কবর দেওনের মাটি পাইতেছিলাম না। শ্যাষে মাটি খুঁজতে
গেলাম আমার বাপের বাড়ী।

এক নৌকায় আসমার লাশ, আরেক নৌকায় আমি আর তারেক।
তারেক খালি ওই নৌকায় যাইতে চায়। ওই নৌকায় যাইবো।

'মাটির ময়না' তো আর ছবি না- ওর নিজের কথা, নিজের গল্প।
ওরে আল্লাহ, ও আল্লাহ- আল্লাগো আমার
আমার মাটির ময়নাডা কেমনে ভাইঙ্গা গ্যালো-
আমার মাটির ময়নাডা কেমনে ভাইঙ্গা গ্যালো, কেমনে ভাঙলো।
আমার মাটির ময়নাডা কেমনে ভাইঙ্গা গ্যালো।

পুনশ্চঃ শুনছো- তারেক ঐ দূর থেকে ডাকছে-
মা তুমি আর কেঁদো না। তোমরা কেউ মায়ের চোখের জলটুকু
মুছে দাও না!

সমাজের রূপ

মোঃ কাঞ্চন মিয়া
অফিসার, এইচ আর ডি
অবনী নিট ওয়্যার লিমিটেড (এক্সটেনশন)

হায়রে সমাজ কেমন রেওয়াজ চলছে সবার মাঝে,
ভালো থাকে কালো রূপে মন্দ রঙিন সাজে।

অন্ধ দেখায় পথের দিশা নেই আলো যার চোখে,
মধুর কথা বলছে বোবা নেই ভাষা যার মুখে।

পশুর মতো হিংস্র যারা শোনায় প্রেমের গান,
ভন্ডরা আজ উল্লসিত হাতে জয় নিশান।

চোরে বলে ধর্ম কথা, কর্ম যাদের মন্দ,
অমানিশার পূর্ণিমা চাঁদ দেখছে সকল অন্ধ।

দুষ্ট প্রজার রাজ শাসনে রাজায় করে ভিক্ষা,
বিজ্ঞরা যায় পাঠশালাতে অজ্ঞরা দেয় শিক্ষা।

কাকতালীয়

মোঃ আখতার হোসেন
ম্যানেজার
ব্যাবিলন লজিস্টিক্স লিমিটেড

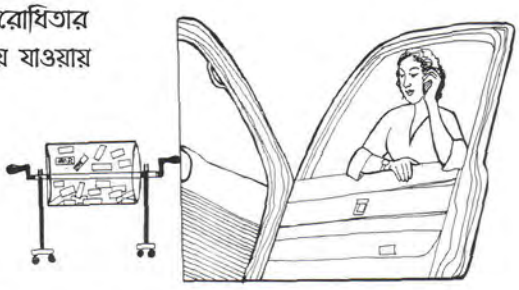

দুজন যুবক যুবতী অনেকদিন মন দেয়া-নেয়ার পর উভয় বাড়ির ঘোর বিরোধিতার মুখে শেষ অব্দি কোর্টে গিয়ে বিয়ে করে ফেলে। বাড়ি ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় একটি পরিবারের সাথে সাব-লেট করে মাথা গোঁজার ঠাঁই পায়।

বর-কনে দুজনেই বেসরকারী এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। দুজনের সামান্য জমানো টাকা সম্বল করে সংসার যাত্রা শুরু হয় তাদের। অল্প কিছুদিনের মধ্যে স্বপ্নরাজ্য থেকে বাস্তব জীবনে নেমে আসে তারা। বাবা-মার সংসার থেকে যখন যা চেয়েছে, পেয়েছে। পার্কে ঘুরে বেড়িয়েছে, খেয়েছে ফাস্টফুড বা অন্য কোন নামী রেস্তোরায়। কিন্তু এখন দিন বদলে গেছে। প্রতিটি পয়সা খরচ করতে হয় হিসেব করে। বিলাসিতা দুরে থাক দরকারী জিনিসটাও যোগানো কঠিন এখন।

সীমার ছোট বোন রীমা বাবা-মাকে বোঝাবার কম চেষ্টা করেনি। সফল হয়নি। রবিনের বাড়িতেও একই ব্যাপার। ছোট ভাই- রানা ভাইয়া-ভাবীর প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু সেও পারেনি বাবা-মার মন ভেজাতে। রীমা ফোনে যোগাযোগ রাখে তার আপুর সাথে-রানাও ভাইয়ার খোঁজ খবর নেয় মোবাইল ফোনে।

দেখতে দেখতে জমানো টাকা শেষ হয়ে আসে। তবে দুটো টিউশনি যোগাড় করতে ভার্সিটি ছাত্র-ছাত্রীর তেমন অসুবিধে হয় না। এক সময় মাসও পেরিয়ে যায়। সাগ্রহে অপেক্ষায় থাকে দুজন টিউশনির টাকা পাবার।

মাসের সাত তারিখে সীমা তার টাকা পেয়ে যায়। বাচ্চা মেয়ের মত আনন্দে নেচে ওঠে সীমার মন। মনে মনে ছক কষে ফেলে কিভাবে টাকাটা খরচ করবে।

বাড়ি ফিরে দেখে রবিন তখনো ফেরেনি। তালা খুলে ঘরে ঢুকে সে। ফ্রেশ হয়ে ফোন করে রবিনকে।
- হ্যালো রবিন।
- হ্যা, বলো। আমি এখনো বাসে-ওপাশ থেকে জবাব আসে রবিনের।
- কতক্ষণ লাগবে ফিরতে ? সীমা জানতে চায়।
- লাগবে একটু। জ্যামে আটকে আছি। এসে যাবো।
- হ্যা জলদি এসো। বলে ফোন রেখে দেয় সীমা।

গুলশান এক থেকে আজিমপুর বাসস্ট্যান্ড আসতে পাক্কা দুঘন্টা লেগে যায় রবিনের। এরপর বাকিটা পথ হাঁটা।

দরজা খুলে দিয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরে সীমা রবিনকে। দুচোখে খুশী উপচে পড়ে তার। দুহাতে আলতো করে সীমার গাল টিপে দিয়ে রবিন বলে-
- টাকা পেয়েছো বুঝি ?
- জ্বি সাহেব। আপনি পাননি ?
- আমিও পেয়েছি ম্যাডাম। বার করছি দাঁড়ান। বলে পকেটে হাত ঢোকায় রবিন তার ওয়ালেট বের করবার জন্য।
- আরে আমার মানিব্যাগ গেল কোথায় ? এই পকেটেই তো রেখেছিলাম। আতঙ্কিত হয়ে রবিন তার অন্য সব পকেট হাতড়ে দেখে।
- নাহ্ নেই। হতাশ হয়ে সে বসে পড়ে বিছানার উপর। পকেটমার হয়ে গেছে বাসের ভেতরে। রবিনের কন্ঠে হাহাকার।
- রুম ভাড়া দেবো কোত্থেকে আর মাসইবা চলবে কিভাবে ? ক্লান্ত ও হতাশ রবিন টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়। কষ্টে সীমার চোখে পানি চলে আসে। কিন্তু পরক্ষণেই সে সামলে নেয় নিজেকে। রবিনের পাশে বসে সে তার মাথাটা কোলে তুলে নেয়। চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলে-

– এতো ভাবছো কেন? আমার টাকাটা তো আছে। এ দিয়ে কষ্টে-সিষ্টে চালিয়ে নেবো। নাও ওঠো এবার। হাত-মুখ ধুয়ে এসো খেতে বসবো।
– ভেবেছিলাম একটা সালোয়ার কামিজ কিনবো তোমার জন্য। এক কাপড়ে বেরিয়ে এসেছো বাড়ি থেকে।
– সেতো তুমিও। আমিও তো ভেবেছিলাম তোমার জন্য একটা শার্ট কিনে সারপ্রাইজ দেবো। যা হোক বাদ দাও এ সব। পরের মাসে কিনবো।
– কাল প্রথম রোজা। চলো আমরা প্রথম রোজায় বাইরে ইফতার করি। উঠে বসতে বসতে বলে রবিন।
– খরচের কথা ভেবোনা। ও আমি ম্যানেজ করে নেবো। সীমা আপত্তি জানাবার আগেই রবিন তাকে আশ্বস্ত করে।
– আচ্ছা তাই হবে। যাও এবার বাথরুমে।

গরম দিনে রোজা। একটা ফাস্ট-ফুড রেস্তোরার সামনে যখন রিকশা থেকে নামে দুজন তখন ইফতারির আর আধাঘন্টা মতো বাকী। দুজনের একটা টেবিল খুঁজে নিয়ে বসে সীমা ও রবিন। ইফতার শেষে দুবোতল পেপসির অর্ডার দেয় সীমা। বলে পেপসির দাম সে দেবে। রবিন স্মিত হেসে সম্মতি দেয়।

সীমা বেয়ারার হাত থেকে পেপসি বোতলের ছিপি দুটো রেখে দেয়। রবিন একটু অবাক হয়। স্ট্রতে মুখ লাগায় সে। সীমার মনোযোগ এখন ছিপি দুটোর ভেতরে ছবির দিকে।

– ওমা দেখো কি পেয়েছি! খুশীতে চিৎকার করে ওঠে সীমা। আশেপাশের টেবিলের মুখগুলো দ্রুত ঘুরে যায় ওদের দিকে।
– দেখি কী! আরে এযে মারুতি গাড়ির ছবি ! রবিনও তার উত্তেজনা চেপে রাখতে পারে না।
– আমরা গাড়ি পেয়ে গেছি। সীমা লাফিয়ে ওঠে চেয়ার ছেড়ে।

সে সময়টাতে পেপসি কোম্পানির তৈরী কোমল পানীয়র বিক্রি বাড়াবার জন্য বিশেষ প্রচারাভিযান চলছে। রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে পরামর্শ দেয় পেপসির তেজগাঁ অফিসে যোগাযোগ করতে।

ঘন্টা দুয়েক পরে যখন দুজন তেজগাঁ পেপসি অফিস থেকে তিন লক্ষ টাকার একটা পে-অর্ডার নিয়ে বেরিয়ে আসে তখন তারা ভাবে দুনিয়ায় তাদের চেয়ে সুখী আর কেউ নেই। স্বস্তিতে ছেয়ে যায় দুজনের মন। পাশ করে চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত একটা নিশ্চিত জীবন ধরা দিয়েছে – ভাবে তারা।

– তোমার পকেটমারই যেন ভাগ্য খুলে দিল আমাদের। আদুরে গলায় বলে সীমা।
– ঠিকই বলেছো। রবিন একমত হয়। একটা ইয়েলো ক্যাব থামায় সে। গাড়ীতে উঠে বসতেই সীমার ফোন বাজে। অতি পরিচিত নম্বর। হতভম্ব সীমা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না।
– হ্যালো ------ মা! গলা কেঁপে যায় তার।
– সীমা– কেমন আছিস মা ?
– আমি----- আমরা ভালো। তোমরা কেমন আছো? বাবার শরীর-------? কথা শেষ করে না সীমা।
– আমরা সবাই ভাল আছি। তোর বাবার শরীরও ভালো আছে। উনি বলছিলেন তুই যেন রবিনকে নিয়ে বাসায় আসিস।
--- আর কিছু শুনতে পায়না সীমা। দুচোখ পানিতে ভরে যায় তার। সে ভেবে পায়না মায়ের ফোনটা স্বপ্ন কিনা।
রবিন সীমাকে কাছে টেনে নেয়। চোখের পানি মুছে দেয় হাত দিয়ে গভীর মমতায়। মুখে তারও আনন্দের হাসি।

বাড়িতে তাদের জন্য অপেক্ষা করে আরেক বিস্ময়। প্রবেশ দ্বারে দেখা মেলে রবিনের ছোট ভাই রানার।

– এই তোমাদের ফেরা হলো। সেই কখন থেকে বসে আছি। বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে উঠে ছোট ভাইকে জড়িয়ে ধরে রবিন।
– একটা ফোন তো দিবি বোকা!
– সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছি। ফোন কেন দেব ?
– হয়েছে, চল ওপরে। আব্বা-আম্মা কেমন আছেন ?
– সবাই ভালো। আব্বার হুকুম তোমাদের দুজনকে আজই বাসায় নিয়ে যেতে হবে। রোজার মাসটা বাইরে কাটাতে হবে না।

সীমা-রবিন ভেবে পায় না– এত সৌভাগ্য-আনন্দ কাকতালীয় হয় কিভাবে।

বাংলার গান

মোঃ আলমগীর হোসেন
নিরাপত্তা প্রহরী
অবনী নিট ওয়্যার লিমিটেড

বাংলা মোদের মায়ের ভাষা,
বাংলা মোদের আশা।
বাংলা মোদের মিষ্টি মধুর,
বাংলা ভালোবাসা।

এ দেশেতে রাখাল কৃষাণ,
বাজায় বাঁশের বাঁশি।
এই দেশের চাষার মুখে,
খেলে চাঁদের হাসি।

বাউল সুরে কণ্ঠ ছেড়ে
গায় সে খুশির গান।
মাঠে মাঠে সুরের তালে
চাষী কাটে ধান।

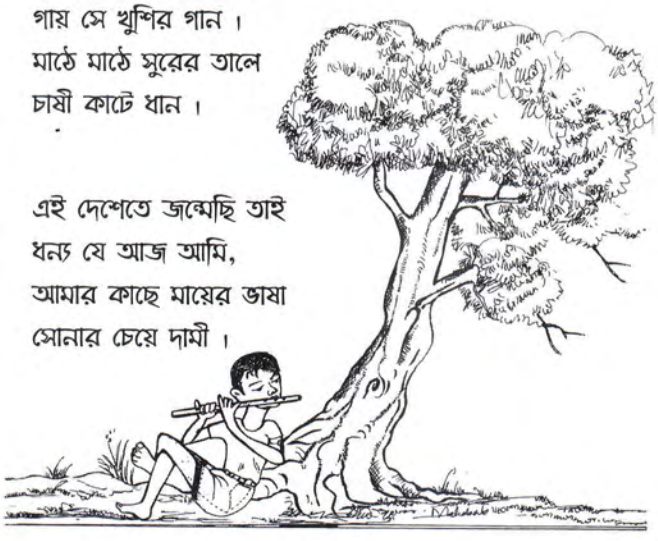

এই দেশেতে জন্মেছি তাই
ধন্য যে আজ আমি,
আমার কাছে মায়ের ভাষা
সোনার চেয়ে দামী।

অসহায়

মোঃ তারিকুল ইসলাম
জুনিয়র অফিসার, ফিনিশিং
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

আমার নাম তারিকুল,
বুঝোনা কেউ আমায় ভুল।
জীবন এক ঝরা ফুল,
পাইনা খুঁজে সুখের কূল।
চাঁদের বুকে জোছনা,
আমার বুকে বেদনা।
আঁধার আমার ভাল লাগে,
আলো আমার খারাপ লাগে।
নদীর আছে ঢেউ,
আমার নেই কেউ।
গাছের আছে লতা,
আমার আছে ব্যথা।
ফুল ফুটে ঝরে যায়,
আমার কথা রয়ে যায়।

"তুমি দেখেছো কি, অগুনতি মানুষের ভীড়ে হেঁটে যাওয়া কোন এক মেয়ে..."

আব্দুল্লাহ আল রানা ফরহাদ
ম্যানেজার (আর এন্ড ডি)
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড, ব্যাবিলন ড্রেসেস লিমিটেড

"কলার পিছ কত কইরা?"

নদ্দা বাজারের ঠিক যেখানটাতে আওয়ামীলীগের অফিস, তার পাশে মাঝারি আকৃতির বটগাছ, ঠিক তার নীচে এক চা- সিগারেটের টং দোকান, সেখানটাতে দাঁড়িয়ে সেঁজুতির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। "অপেক্ষার কষ্ট মৃত্যুর সমান" কোথায় যেন শুনেছিলাম। আর সেই মৃত্যুকে এড়াতে আলগোছে একটা সিগারেট ধরিয়ে বেশ উদাসী ভঙ্গীতে আকাশ দেখছিলাম। (বলে নেয়া ভালো, এই ভঙ্গীটা নাকি মেয়েদের মনে মায়া মহব্বতের জন্ম দেয়, আর আমার মনেও সুপ্ত ইচ্ছা ছিল সেঁজুতি এই ভঙ্গীটা দেখুক)। যা হোক, এই ভঙ্গীটাতে ব্যাঘাত ঘটালো প্রশ্নটা,

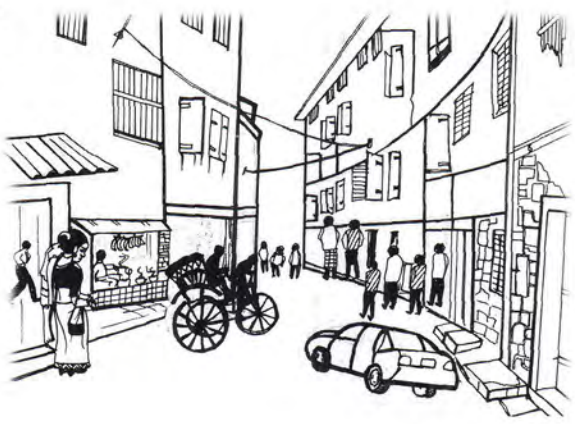

"কলার পিছ কত কইরা?"

যখনকার কথা বলছি তখন কলা টাইপের খাদ্যবস্তু পিছ হিসাবে দরদাম হতো না, হতো হালি নতুবা ডজন হিসাবে। এই খটকা আমার উদাসী দৃষ্টিকে আকাশ থেকে ধরণীতে নামিয়ে তাক করালো প্রশ্নকারিনীর দিকে, অতঃপর তার ইঙ্গিতকৃত কলার দিকে। অতি পেকে পাকা হয়ে যাওয়ার কারনে ছড়া থেকে স্বভাবগত ঝরে পড়া কলাগুলির সারা শরীরে কুনো ব্যাঙের আচিল, বোটার কাছে পচনের আভাস, আর সেই কলাকেই সম্মান জানাতে "কদলি" ডাকতে ইচ্ছা হলো, যখন তার দাম হাকা হলো.....

"১২ টাকা হালি"

আমি চমকিত, অথচ প্রশ্নকারিনী নির্বিকার তবে কণ্ঠে যেন একটু দীর্ঘশ্বাসের টান, সাথে একটু রুক্ষতাও...
"এই কলাতো পইচা যাইতাছে, এর দাম ১২ টাকা? ৮ টাকায় দিবা?"

"পচা কলা নেওনের কাম কি? এক দাম, নিলে নিবা, না নিলে নাই, মিজাজ দেখাও ক্যান?"

এরপর শুরু হয় বাছাবাছি, ৩ টাকায় ১ টা কলা কেনাও হয়। ফের উদাসী ভঙ্গীটাতে ফিরে যাবো তখন-ই লক্ষ্য করি তার আড়ালের শিশুটিকে, হাতে কলা নিয়ে জগতজয়ী হাসি। তাদের চলে যাওয়া দেখি। তখন কানে আসে বিক্রেতার স্বগতোক্তি,

"নিবো একটা কলা, বাছনের ভাব কত।"

আমি আধপোড়া সিগারেটের দিকে তাকাই... বেনসন এন্ড হেজেস তখন ৪ টাকা। কিছুটা অপরাধী ভঙ্গীর ভাব নিয়ে

কলাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করি,

"ভাইজান, ভাবের কি দেখলেন?"

"আরে ভাই, গার্মেন্টেস-এর এই বেডিগুলানের কথা আর কইয়েন না, এগো দেমাগ দেখলে শরীলডাতে আগুন ধইরা যায়" পাছে তার শরীরে ধরা আগুনে আমার সিগারেটের পুড়তি বেড়ে যায়, এই ভয়ে একটু সরে আসি। আগ্রহ জন্মে সেদিনটাতেই। (বিশ্ববিদ্যালয়ের পাট চুকিয়ে প্রায় সব বন্ধু গার্মেন্টস-এ চাকরি নিয়েছিলো, আমি ছিলাম ব্যতিক্রম)। বন্ধু পিপলু আর মারুফের সাথে কথা বলে কৌতুহল বাড়ে, বাংলাদেশ অটোমেশনের ছাপোশা চাকরিটা ছেড়ে উর্মি গ্রুপে ঘোরাঘুরি করি, চাকরি হয় সিডকো গ্রুপে। শারীরিক অসুস্থ্যতার জন্য চাকরিটা হারাই ১৯ দিনের মাথায়। আর এই কারণে গার্মেন্টস থেকে মন উঠি উঠি ভাব, তখনই মনোয়ার ভাই-এর ফোন, জয়েন করি এন-এ-জেড (নাজ)- এ। আমার জীবন শুরু হয় রাজেন্দ্রপুর বাজারে। তবে শুরুটা সুখকর ছিলো না মোটেও। বৈরী পরিবেশ, ওয়ার্কার থেকে শুরু করে প্রোডাকশন ম্যানেজার কেউই পাত্তা দেয় না। যে লাইনে কাজ শুরু করার দায়িত্ব পাই, সে লাইনের লাইন চীফের সাথে কথা-ই-বলতে পারিনি। "ওয়ার্ক স্টাডি" শব্দটা তাদের কাছে "ওয়াক স্টাডি" মানে "হেঁটে বেড়ানো" আর "আকাইম্মা কথাবার্তা"। কিছুটা হতাশ হই, ভেঙে পড়িনা। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়াররা কেন গত ছয় বছরে গ্রহনযোগ্যতা পায়নি তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি। সমাধান পেতে দেরি হয় না মোটেও।

সদ্যপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার খেতাবটার গম্ভীর খোলস ছেড়ে চেষ্টা করি তাদের একজন হতে। লাইন চীফ পারভেজের পেছনে ঘুরি প্রায় এক সপ্তাহ। ঠিক এক সপ্তাহ পর,

"আপনের সমস্যা কি?"

"না ভাই, আপনার সাথে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা, গার্মেন্টস-এ কাজ করতে আসছি, আপনারা অভিজ্ঞ মানুষ, আপনাদের কাছে শেখার ইচ্ছা রাখি।"

"কেন? আমাদের কাছে শিখবেন কেন? পড়ালেখা কইরা কিছু শেখেন নাই?"

"বল্লাম না ভাই, আপনারা হইলেন অভিজ্ঞ, গুরু লেভেলের মানুষ, আপনারা না শিখালে শিখাবে কে?" একটু আড়মোড়া ভাঙার ভাব করে নীচু স্বরে বলি, " পড়ালেখার কথা বল্লেন না, ওখানে একটু সমস্যা আছে।"

পারভেজ-ও একটু কাছে সরে এসে নীচু স্বরে জিজ্ঞাসা করে, "পড়ালেখায় আবার কি সমস্যা?"
"না মানে নকল সকলের ব্যাপার তো, এই আর কি... কাউকে বইলেন না যেন আবার..."

এই কথাতে তার মুখে একটু হাসি দেখতে পাই, শুরু হয় আমার পথ চলা। যত দূর মনে পড়ে কিভাবে সুতা কাটতে হয় সেটা নিয়ে আমাকে বিশদ ট্রেনিং দিয়েছিলো রিনা, চেইন স্টিচ খোলা শিখেছিলাম পারুলের কাছে। দ্বিতীয় সপ্তাহে আমি গার্মেন্টস জগতের সবচেয়ে বেশি বেতনের হেল্পার হিসাবে কাজ শুরু করি। এরপর আমার পুঁথিগত বিদ্যাকে প্র্যাকটিক্যালের সাথে মেলাতে আর সমস্যা হয়নি। আমি টাইম স্টাডির কথা বলতাম, আরগোনোমিক্স এর কথা বলতাম, লাইন ব্যালান্সিং এর কথা বলতাম, ওরা আমাকে সাহায্য করতো কিভাবে তা বাস্তবে রূপ দেয়া যায়। আমি তখন আর ভিন্ন কেউ নই। আমি ক্রমে তাদের একজন হয় উঠি, আমি হয়ে উঠি রিনা, পারুল, সালাম, কালাম, রাজিয়া, শিউলি, রুপালী আর কতশতজনের একজন। এর মাঝে রিনা ও শিউলি থাকতো রাজেন্দ্রপুরেই। কাঁচা বাজার করতে যেয়ে দেখা হত, দরদামে আমার অপটুতা দেখে তারা নিজেরা দরদাম করতো, যাতে দোকানদার আমাকে ঠকাতে না পারে।

এর মাঝে আমাকে চমকে দেয় রাজিয়া। আমরা তখন পরীক্ষা নিয়ে হেল্পারকে অপারেটর করতাম। লাইনচিফ পারভেজ

একদিন আমাকে বললো, "এই মেয়েটারে হেল্পার থেকে অপারেটর করে দেন, আল্লাহ আপনাকে অনেক ভালো করবে।"

আমি বল্লাম "কি ভালো করবে ?"

পাশ থেকে সালাম বলে উঠে, "স্বাস্থ্য ভালো করবে..."
স্বাস্থ্য ভালো করার এই সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে আর দেরি করিনি। পরীক্ষা নেয়া হলো, মেয়েটা ভালোভাবেই পাশ করলো। আমার ম্যানেজার তার বেতন ধরলেন। ১৭৬৫ টাকা থেকে বেতন হলো ২২০০। গ্রেড অনুযায়ী হাতে আরো ১০০ টাকা ছিলো। দেয়া যেত। আর তাই আমার মনে খুঁত খুঁত ছিলো অথচ রাজিয়ার চোখে পানি দেখেছিলাম, এই ক'টা টাকা যে মানুষকে কাঁদাতে পারে সেই ধারনা ছিলোনা (ওহ! ভালো কথা আমার ওজন কিন্তু এক গ্রামও বাড়েনি...)

রাজেন্দ্রপুর বাজারে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দুই দেব শিশু এসে টপাটপ পায়ে হাত দিয়ে সালাম। আমি ভরা মজলিসে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি, দেখি একটু দুরে রাজিয়া দাঁড়িয়ে হাসছে। বাচ্চা দুটোকে নিয়ে এগিয়ে যাই, সেখানে দাঁড়িয়ে তার জীবন যুদ্ধের কথা শুনি। স্বামী পরিত্যক্তা এই মেয়ে, গত পাঁচ মাস ধরে ১৭৬৫ টাকার বেতনে সন্তানদের লেখাপড়াসহ সংসার চালাচ্ছে। আমি থমকে যাই, এ কিভাবে সম্ভব ! মনে পড়ে মানোয়ার ভাই-এর সেই উক্তি, "এ এক অদ্ভুত ভিন্ন জগত।" কথাটার সত্যতা হাড়ে হাড়ে টের পাই।

১৭ই মার্চ ২০১২, আমি রিক্সা করে নতুন অফিসের দিকে যাচ্ছি। রাস্তার পাশে পিপিলিকার সারির মত মেয়েরা। রিক্সাওয়ালা বেল দিতে দিতে বিরক্ত, মুখে খিস্তী তার সাথে যোগ দেয়া গাড়ির হর্ণ। আমি রিক্সাওয়ালার কাঁধে হাত রেখে বলি, "গালি দেয়ার আগে শুনে রাখেন ভাইজান, এরা আমার সহকর্মী, বাঙালী জাতীর যদি মেরুদন্ড বলে কিছু থাকে তবে সেই মেরুদন্ডের মূল দন্ড হলো এই যে এরা।"

রিক্সাওয়ালা কথার মাথামুন্ডু না বুঝে ভ্যাবলার মত তাকায়, আমি কিঞ্চিত হেসে বলি,

"তাকিয়ে দেখো তুমি
হাতে খাবারের বাটি
অল্প হেলে দুলে
চলছে গুটি গুটি,
শত কষ্ট গাঁথা
এদের জীবন মালা
তবু তারা হাসেন
তাদের হাসিতেই
বিধাতা যিনি আছেন
এ পোড়া দেশের
ভাগ্যটাকে লেখেন।"

লাল রঙের মেলা

মোঃ সাকিল শেখ
লাইন আয়রনম্যান
সুরভি গার্মেন্টস লিমিটেড

নানা রঙের পৃথিবীতে
হাজার রঙের মেলা
সকল রঙের মাঝে যেন
লাল রঙটাই সেরা ।

লাল রঙেতে সূর্য উঠে
লাল রঙেতে ডোবে,
রংধনুতে লালের খেলা
লালে পলাশ ফোটে ।

লাল গোলাপে হয়যে প্রণয়
লাল সিঁদুরে বিয়ে,
লাল রঙেরই ছোঁয়া থাকে
কপালের ঐ টিপে ।
লাল শাড়িতে নববধূ
লাল চুড়িতে সাজ,
ফাগুন দিনে কৃষ্ণচূড়ায়
লালের কারুকাজ ।

লাল রঙেতে অগ্নিশিখা
লালে রক্তকণা,
লাল মেহেদীর কারুকাজে
হয় যে আলপনা ।

তুমি শুধু সুখে থাকো

শ্রীনিবাস চন্দ্র রায় (হৃদয়)
জুনিয়র সুপারভাইজার, কাটিং
সুরভি গার্মেন্টস লিমিটেড

হয়তো তোমায় পাবনা আমি
চিরদিনের তরে,
হয়তো আমার ভালবাসা
থাকবে পথে পড়ে ।

স্বপ্ন আমায় দেখালে তুমি
নয়ন দুটি ভরে-
এখন কেন দু চোখেতে
অশ্রু শুধু ঝরে ।

জানতাম যদি ভালোবাসা
কাঁদাতে শুধু জানে
কোন দিন বাসতাম না ভালো
তোমায় মনে প্রাণে ।

ছলনা করে ওগো প্রিয়া
কি সুখ তুমি পাও,
আমায় শুধু সেই কথাটা
একবার বলে যাও ।

দুঃখে আমি থাকি ওগো
কোন ক্ষতি নাই,
তুমি শুধু সুখে থাকো
দোয়া করি তাই ।

অবজ্ঞা

রাবেয়া খাতুন
অফিসার, প্যাটার্ন
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

ছোট্ট একটি মেয়ে। ফুটফুটে কালো, তার বাবা শখ করে নাম রেখেছে কাজল। সারাদিন মায়ের আঁচল ধরে পিছে পিছে ঘুরেই তার বেড়ে ওঠা। স্কুলে ভর্তি হওয়া থেকে শুরু হলো তার বাইরে যাওয়া। সকালে মাদ্রাসা, তারপর স্কুল সেরে আবার মায়ের পিছে থাকা। যদিও পাশের বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতে যেতো সে। তাও থাকতো মায়ের দৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এক মুহূর্ত চোখের আড়াল হতে দিত না। কারণ মেয়ের কোন দুর্ঘটনা সহ্য করা মায়ের কাছে কষ্টসাধ্য ছিল। তাই মা সব সময় সচেতন থাকতেন। কাজল যখন হাইস্কুলে ভর্তি হলো সেই থেকে তার বাড়ির বাইরে খেলাধুলা বন্ধ হয়ে গেল। কাজল যতই কালো হোক মা-বাবার দৃষ্টিতে তাদের মেয়ে বিশ্বের সেরা সুন্দরী। বখাটে ছেলেদের নজরে পড়ে কোনো অনাকাঙ্খিত ঘটনার ভয় তাদের মনে সারাক্ষণ। আর সেই আশঙ্কাতেই কাজলকে বোরকা পরে স্কুলে যেতে হতো। বাড়ি ফিরে একটি টিয়া পাখি, দুটি শালিকের বাচ্চা আর ফুল গাছের পরিচর্যা করেই দিন কেটে যেতো কাজলের। গাঁদা, সন্ধ্যা, বেলি, জুঁই, টাইম, গেট ফুলসহ গ্রামীণ নানান জাতের ফুল তার সংগ্রহে। এ ছাড়া অবসরে গল্পের বই, ম্যাগাজিন পড়া তার শখের আর একটি অংশ। সে যখন দশম শ্রেণীতে তখন তার বাবার পরিচিত এক ভদ্রলোক বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে তাদের বাড়িতে এলো। কাজলের বাবা অতিশয় ভদ্রলোক। তাই ছেলের বাবা তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে আগ্রহী। এতো বেশি আগ্রহ দেখে কাজলের বাবা সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইলেন না। অমনি মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজি হয়ে গেলেন।

বিয়ের সব আলোচনা শেষ। বিশেষ আলোচনায় উঠে এলো যৌতুকের কথা। আমাদের সমাজের প্রেক্ষাপটে বিয়ে আর যৌতুক ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। একটা ছাড়া আর একটা যেন অপূর্ণ থেকে যায়। বাবা এটা চিন্তা করেই তিল তিল করে দিয়েছেন মেয়ের বিয়ের যৌতুকের টাকা। ছেলে পক্ষের চাহিদা মেটাতে এতোটুকু কার্পণ্য করেননি তিনি। সবাই খুশী, বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল।

অবুঝ কাজল। বিয়ের কথা শুনে আনন্দে আত্মহারা। অবুঝই বলা চলে। বিয়ে, স্বামী, সংসার এ সবের অনুভূতিগুলো তার মধ্যে বিকশিত হয়নি। সে একটা অফুটন্ত ফুল। তাকে নিয়ে বাবা মা আর দুশ্চিন্তা করবে না, চোখে চোখে রাখতে হবে না। মুক্ত স্বাধীন বিহঙ্গের মত ডানা মেলে আকাশে উড়ে বেড়াবে এ ভেবেই সে খুশী। দৌড়ে যায় পাখিদের কাছে। তাদের কলকাকলীতে বুঝে ফেলে তারা তাকে বিদায় দিতে চায় না। কাজল বলে ওঠে, চিন্তা করিসনারে, আমি তোদের নিয়ে যাবো। আবার দৌড়ে গিয়ে বাবার কাছে নির্লজ্জের মত জিজ্ঞেস করে, বাবা তুমি তো সজলদের বাড়ি চেন, কি রকম বাড়ি বলোনা। বাবা মুচকি হেসে বলেন, এই ধরো মেইন রাস্তা থেকে ৫০ গজ ভিতরে হবে। কাজল আর কিছু শোনার অপেক্ষা না করে চট করে চিন্তা করে ফেলে তার ফুলগাছগুলি ওই ৫০ গজের গলি রাস্তার দু'পাশ দিয়ে সাজিয়ে লাগাবে। কাজল বেজায় খুশী।

ওদিকে ছেলের বাড়ি বিয়ের আয়োজনে আত্মীয়-স্বজন আসতে শুরু করেছে। তার মধ্যে অন্যতম ঢাকা থেকে আসা সজলের সেজ খালা। সবাই তাকে একটু বেশি সমীহ করে। খালা এতো আয়োজন দেখে এক নজর কনে দেখার লোভ সামলাতে পারছিলেন না। পরদিন ছুটে এলেন কাজলকে দেখতে। ঘরে ঢুকিয়ে মধ্যযুগীয় কায়দায় তাকে দেখলেন। তারপর কাজলের বাবার কাছে যেয়ে খুব ভদ্রভাবে বললেন, ভাই কথাটা বলতে খারাপই লাগছে। আপনারা অনেক দুর অগ্রসর হয়েছেন। তবু কিছু করার নেই। কারণ এটা জীবনের ব্যাপার। তাই বিয়েটা হচ্ছে না। কাজলের বাবা অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, কেন? খালা বললেন, আপনি তো জানেন আমাদের ছেলের গায়ের রং কালো। তাই এতো কালো মেয়েকে ছেলের বউ করা

যাবেনা। কথাটা শুনতেই কাজলের বাবার মুখমন্ডল নীলবর্ণ ধারণ করলো। তিনি নিজেও জানেন এই সমাজে কালো মেয়ের কি মূল্যায়ন। তাই এই প্রত্যাখ্যানে কোন প্রতিবাদ তিনি করতে পারলেন না। শুধু এটুকু বললেন, বোন, আল্লাহ বানিয়েছে কালো, আমারতো কোন হাত নেই। ভদ্রমহিলা আর একমুহূর্ত না দাঁড়িয়ে রওয়ানা করলেন। বাড়িতে ফিরে চিৎকার করে বলতে শুরু করলেন, তোমাদের কি কোন আক্কেল-জ্ঞান নেই? এই কালো ছেলেটার জন্য ঐ ভূতের মতো মেয়েটাকে পছন্দ করে আসলে। একবারও ভাবলেনা এদের ছেলে-মেয়েদের সবাই কালো হবে। তোমরা কি বংশটাকে কালো বানিয়ে ফেলতে চাও? কথাটা শুনে সবার টনক নড়লো। একটাই পোরগোল – ও তাই তো ব্যাপারটাতো ভাবা হয়নি। মতের পরিবর্তন এলো, ভেঙ্গে গেল কাজলের বিয়ে।

এই ঘটনার পর থেকে কাজলের মনে একটাই প্রশ্ন, সে কি দেখতে খুব বিশ্রী? কই কখনো তো বাব-মা, পাড়া-প্রতিবেশী কেউ এ কথা বলেনি। তাহলেকি একটা মেয়ের সৌন্দর্য নির্বাচনের এইটাই পরীক্ষা? কাজল পরীক্ষায় ফেল করেছে। কিন্তু এই পরীক্ষায় পাস করার জন্য কিই-বা করার আছে তার। ভাবতেই মনের মুক্ত আকাশে স্বাধীনভাবে উড়ন্ত স্বপ্নের একটা পাখা ভেঙ্গে গেল। কাজলের চিন্তায় বাবার মনও বিষন্ন। বিমর্ষতা নিয়ে তার কেটে যায় একটি বছর। একসময় ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। হঠাৎ একদিন সেই অসুস্থতাই তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেয়। আজ কাজলের আর একটি পাখা ভেঙ্গে গেল। কাজলের মা স্বামীর মৃত্যুর পর নানাভাবে যুদ্ধ করে মেয়েকে আঁকড়ে ধরে দিন অতিবাহিত করে যায়। ইদানিং কাজলের প্রতি গ্রামবাসীর সহানুভূতি বেড়ে গেছে। কেউ না কেউ প্রতিদিন একবার করে হলেও একটা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে। কাজলের মা নির্বাক নিঃস্তব্ধ হয়ে শোনে। তারা চলে গেলে শুধু চোখের পানি ঝরায়। একটা সময় বলেই ফেলে, তোমরা কি শুরু করেছো? কেউ সতীনের, কেউ বিপত্নীকের, কেউ প্রতিবন্ধী আবার কেউ আসে বখাটে ছেলের ঘর নিয়ে। আমার মেয়ে কি এতই পঁচে গেছে? একজন ভদ্রমহিলা শান্তভাবে বললেন, রাগ করো না কাজলের মা। কাজলের বাবা নেই। আর বাপ-ভাই না থাকলেতো দু'মিঁড়ি নিচে নামতেই হবে। তার উপর মেয়ের যা গায়ের রং তাতে এর চেয়ে ভাল ছেলে পাওয়া কঠিন। তাই বলছি দু'মুঠো খেয়ে পরে বাঁচতে পারে এ রকম হলেই দিয়ে দাও। কাজলের মা বিনয়ের সথে বলে, তোমরা আমাকে মাফ করো। এসব প্রস্তাব নিয়ে আর এসো না। দু'মুঠো খেয়েই যদি বাঁচতে হয়, আমিতো আর মরে যাইনি। মায়ের কথায় কাজল চোখে পানি ধরে রাখতে পারে না। ছোটবেলা থেকেই নীরব থাকা তার চারিত্রিক স্বভাব। তাইতো অন্যায়ের প্রতিবাদ, অযৌক্তিক কথার যুক্তি খন্ডানো সে শেখেনি। আর এই না পারার কষ্টগুলি বুকের মধ্যে জমিয়ে রাখতে রাখতে মনটা পাথরে পরিণত হয়েছে। সে ভাবে, মা আর ক'দিন? তারপর তো নিজেরই চলার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। দু'টি পাখা ভেঙ্গে তার উড়ার শক্তি হারিয়েই তাকে সর্বস্ব হারানোর ব্যথা অনুভব করলে চলবে না। জীবনের পথ অনেক বাকি। অন্তত: সেটা অতিক্রম করার জন্য দু'টি পায়ে ভর করে শক্ত হয়ে তাকে দাঁড়াতে হবে। সে আত্মনির্ভরশীল হতে চায়। একদিন মায়ের অনুমতি নিয়ে এক আত্মীয়ের সাথে সে ঢাকায় চলে আসে। তারা তাকে একটি গার্মেন্টসে চাকরি দিয়ে দেয়। শুরু হয় কাজলের জীবনের সাথে যুদ্ধ। অসহ্য কষ্ট। ভোরবেলা থেকে রাত পর্যন্ত কাজ। অন্যের বাসায় থাকা খাওয়া, সবকিছু তার কাছে মৃত্যু যন্ত্রণার মত মনে হয়। আর এক মুহূর্ত বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না। মনে পড়ে মাকে। তিনিও ইদানিং প্রায়-ই অসুস্থ থাকেন। তার চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করার একটা দায়িত্ব এসে যায়। তাইতো মায়ের জন্য হলেও বেঁচে থেকে এ যুদ্ধ তাকে করতেই হবে। মনটাকে আবার শক্ত করে শুরু করে জীবনযাত্রা। বেতন পায়, বাড়িতে মাকে খরচ পাঠায়, নিজের খরচ চালায়। ভালই আছে কাজল। এভাবে কেটে যায় পাঁচটি বছর।

গার্মেন্টসে বিভিন্ন জেলার হাজারো মানুষের সমাগম। নানান কথা, বিভিন্ন মতামত, পরিবেশ-পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতে কাজলের ঘুমিয়ে থাকা ইন্দ্রিয়গুলো জাগ্রত হতে থাকে। কুঁড়ি হয়ে থাকা আবেগ-অনুভূতিগুলো প্রস্ফুটিত হয়। এখন সে একটি ফুটন্ত ফুল। ঠিক এ সময়ে তার জীবনে আকাশের আবির্ভাব। পাশের ঘরে বেড়াতে আসা আকাশের সঙ্গে পরিচয়। ফোন নম্বর বিনিময়, তারপর থেকে কথোপকথন। ইতিমধ্যে আকাশ তার ভালবাসার কথা প্রকাশ করে ফেলে। কাজল অবাক হয়! সে বলে তুমি আমার বন্ধু, ভালবাসার কথা আসলে কিছু গুণাগুণ দৃষ্টিগোচর হয়। তুমি আমার মধ্যে কি গুণ দেখলে? তোমার সঙ্গে আমার রয়েছে গায়ের রঙের বৈষম্য। তুমি ফুটফুটে ফর্সা, আর আমি কত কালো দেখেছো? আকাশ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। বলে, তুমি একটা পাগলী। মানুষের বাহ্যিক রূপটাই কি আসল রূপ? আমি দেখেছি তোমার অন্তর্নিহিত রূপটি। যেটা আমার এই গায়ের রং থেকে অনেকগুণ সাদা। তাই তোমাকে ভালবেসেছি। কাজলের চোখে পানি এসে যায়। জীবনে এই প্রথম তাকে কেউ সুন্দর বলল। এতোদিনের জমিয়ে রাখা একবুক ভালবাসার সবটুকু আকাশের মাঝে বিলিয়ে দিতে এতোটুকু কার্পণ্য করেনা সে। এই ভালবাসার পবিত্রতা রক্ষার্থে দু'জনেই সচেতন। বিশেষ করে আকাশ এতো বেশি সচেতন যে, যা

দেখে তার ভালবাসার গভীরতা নিয়ে কাজলের মনে সন্দেহ থেকে যায় । তাইতো নানানভাবে তাকে পরীক্ষা করতে থাকে। আশ্চর্যের ব্যাপার প্রত্যেকটিতে আকাশ পাস করে । তারপরও সে একটা শেষ পরীক্ষা করবে, যেটাতে ছেলেরা সব সময় অজুহাত দিয়ে পিছু হটে । দেখবে আকাশ কি করে । ফোন করে সমস্ত দ্বিধা সংকোচ কাটিয়ে বলে ফেলে, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই । মুহূর্তের মধ্যে আকাশ একটি স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে, তুমি জিতে গেছ কাজল । যে কথাটি কিছুদিন ধরে বলবো বলবো করে সাহস যোগাতে পারছিলাম না সে কথাটি তুমি আমাকে বলে সাহায্য করলে । ধন্যবাদ কাজল । তবে এই মুহূর্তে নয়, দু'টি মাস অপেক্ষা করো । আমার পরীক্ষা শেষ হলেই বিয়েটা সেরে ফেলবো । কাজল বুঝে ফেলে এটাই তার অজুহাত । আকাশকে কিছু না বলে নিজেকে গুটিয়ে ফেলতে চায় সে । কিন্তু আকাশ ঠিকই পরীক্ষা শেষ করে বিয়ের দিন ধার্য করে ফেলে । এ সময় কাজল একটু বেঁকে বসে । সে বলে, তোমার বাবা-মাকে জানাও । আকাশ বললো, সে পরে জানানো যাবে । যদি তারা মেনে না নেন তাহলে দু'জনে ভেসে বেড়াবো । পারবেনা তুমি আমার সাথে ভাসতে ? যার জীবনটাই ভাসমান তাকে কি আর ভাসার ভয় দেখানো যায় ? কাজল ফেলতে পারে না আকাশের কথা । নির্দিষ্ট তারিখে বিয়ে হয়ে যায় তাদের । নতুন করে বাসা ভাড়া নেয় । শুরু করে নতুন জীবন । যে জীবনের ব্যাখ্যা এ জীবনে বলে শেষ করা যাবে না ।

ঠিক সাতদিনের মাথায় খবর আসে আকাশের বাবা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে । আকাশ সেই মুহূর্তে রওয়ানা হয় বাড়ির উদ্দেশে । বলে যায়, দু'দিনের মধ্যে ফিরে আসবে । বাড়িতে পৌঁছে কাজলকে জানায় ভালভাবে পৌঁছেছে । কিন্তু পরের দিন ফোন করতেই মোবাইল বন্ধ পায় কাজল । বার বার চেষ্টা করতে করতে চিন্তিত হয়ে পড়ে সে । হঠাৎ মেসেজ আসে তুমি চলে এসো । ক'দিন পর একসঙ্গে ফিরবো । হঠাৎ করে তাকে ডেকে পাঠানোর কারণ বুঝতে পারে না কাজল । কাজল ধরে নেয় বাবা বেশি অসুস্থ, নয়তো আকাশ তাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছে । প্রচন্ড ভালবাসার টানে আর স্বামীর আদেশ পালনে শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হয় সে । মনে পড়ে সজলের খালার অবজ্ঞার কথা । দুশ্চিন্তা হয় তার কালো চেহারাটা নিয়ে । যদি তারাও তাকে অবহেলা করে? তবে এই ভেবে স্বস্তি পায় যেহেতু আকাশ ফর্সা আগামী প্রজন্মটা কালো হয়ে যাবে এ কথাটা অন্তত: বলবেনা । এতোটুকু মনে শক্তি নিয়ে পৌঁছে যায় শ্বশুরবাড়ি । কাজল শাশুড়িকে সালাম করতেই তাকে নিয়ে বারান্দায় বসিয়ে দেয়া হয় । পাড়ার সমস্ত মানুষ ছুটে আসে তাকে দেখতে । হাজারো মন্তব্য । কেউ বলে আহা! চাঁদের কলঙ্ক! তাদের কথার ব্যাখ্যা আকাশ একটা চাঁদ আর কাজল তার উপর কালো দাগ । কেউ আবার বলে গায়ের রং কালো কিন্তু গঠনতো ভালো । এ রকম রোদ বৃষ্টির পরিবেশে অনেকক্ষণ থাকতে থাকতে তার অস্থির লাগতে থাকে । কিন্তু কেউ তাকে ঘরে ঢুকতে বলছে না । তাই নিজেই ঘরে ঢুকতে যায় সে । অমনি এক ননদ ছুটে এসে তাকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয় । কাজল বিপদ আঁচ করে । কিন্তু আকাশ কোথায় ? কে রক্ষা করবে তাকে এই বিপদ থেকে ? কাউকে জিজ্ঞেসও করতে পারছে না । অনেকক্ষণ পর একজন বয়স্ক মহিলা যেন তার মনের কথা বুঝতে পারে । তার কাছে এসে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার ভান করে কানে কানে বলে যায়, আকাশকে তালাবদ্ধ করে রেখেছে । একটু পর বিচার বসবে । কাজলের বুঝতে বাকি রইলনা তার শ্বশুরের অসুস্থতা মিথ্যা । সব পরিকল্পনা করেই তাকে খবর দেয়া হয়েছে । সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয় । গ্রামের কিছু মোড়ল মাতব্বর বারান্দায় এসে বসেন । নানান জেরা চলছে । এরমধ্যে একজন মাতব্বর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ঢাকায় কি করো ? কাজল বললো, গার্মেন্টসে চাকরি করি । মাতবর মুখটাকে বিকৃত করে বললেন, ও তুমি গার্মেন্টসের মেয়ে । তার কথায় মনে হয় গার্মেন্টস কাজলকে জন্ম দিয়েছে । এর মধ্যে আকাশের মা বলে উঠলেন, গার্মেন্টসের মেয়ে বলেই তো আমার সহজ-সরল চাঁদের মত ছেলেটাকে ফুঁসলিয়ে ফাঁসলিয়ে বিয়ে করেছে । এ কথার পর মাতব্বররা বললেন, এ পরিবারে তোমাকে মানায়না, তার চেয়ে বরং ঢাকায় ফিরে চাকরি করে খাও । আকাশের বাবাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি দেন মোহ্‌রা বাবদ কিছু টাকা ওকে দিয়ে দাও । তাদের ভাবটা এ রকম কিছু টাকার কথা বলে যেন সু-বিচার করে গেলেন ।

এবার তারা কাজলকে ঘরে ঢুকতে দেয় । নীরব নিস্তব্ধ ঘরে শ্বশুর আর দেবর বলে, সকালবেলা তোমাকে ডিভোর্স করা হবে । যদি কোন হট্টগোল করো তাহলে খুন করা হবে । ভয়ে আতঙ্কে চুপসে যায় কাজল। গভীর রাত, ঘুম নেই চোখে । যদিও ডিভোর্সটা আকাশের উপর নির্ভর করে । কিন্তু এ পরিস্থিতিতে তাকে বাধ্য করা হবে । আর ডিভোর্স মানেই আকাশকে তার জীবন থেকে চির বিদায় করা । ভাবতেই বুকের মধ্যে ব্যথা অনুভব করে । আকাশ এখন তার চেয়ে বেশি বিপদ আর অসহায় অবস্থায় আছে । এক সময় এ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসবে । সে দিন সে তার কাছেই ফিরে আসবে । তাইতো এক মুহূর্ত এখানে নয় । গভীর রাতে কাজল পালিয়ে ঢাকায় চলে আসে ।

কিছুদিন পর মোবাইলে যোগাযোগ হয়। আকাশ বলে, ওরা আমাকে কড়া পাহারায় রেখেছে। যদি যেতে চাই তাহলে আমাকে খুন করবে। সুযোগ করে আমি ফিরে আসবোই, তুমি অপেক্ষা করো। বাঙালি নারী মনের মধ্যে আল্লাহর পরেই রেখেছে স্বামীর স্থান। তাই আজও স্বামীর ফিরে আসার অপেক্ষায় প্রহর গোনে কাজল।

সমাজের এ রকম হাজার হাজার লাঞ্ছিত, অবহেলিত, নিষ্পেষিত কাজলরা অপেক্ষায় আছে সেই দিনটির যেদিন সজলদের খালারা বাহ্যিক কালোটাকে অবজ্ঞা করে বংশ কালোমুক্ত না করে অন্তরের হিংসা আর অহঙ্কারের কালো মুছে ফেলে পৃথিবীটাকে সাদা করবে। কালো মেয়ের জন্ম দিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বাবাদের আর যৌতুকের টাকা উপার্জন করতে হবে না। অপেক্ষা সেই দিনের– আকাশের মায়েদের নিজের সন্তান অবাধ্য হওয়ার ব্যর্থতার দায়ভার কাজলদের ঘাড়ে তুলে দেবে না। অপেক্ষা সেই দিনের– গ্রামের মোড়ল মাতব্বররা অসহায় কাজলদের ঘৃণা আর তুচ্ছ করে বলবে না, এরা গার্মেন্টসের মেয়ে। তারা বলবে, এরা পরিশ্রমী মেয়ে। সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে ভালবেসে কাছে টেনে বলবে, তোরা অনেক কষ্ট করিস, আয় না বুকে। একটু আদর নিয়ে যা। কবে আসবে সেই দিন ???

ব্যাবিলনের প্রতি

মোহাম্মদ মামুন হোসেন
ড্রাইভার
ব্যাবিলন ট্রিমস লিমিটেড

টিক টিক টিক ঘড়ির কাটা, ঘুম থেকে যাই উঠি।
নাওয়া খাওয়া সেরেই তবে, অফিস পানে ছুটি।
আটটা বাজার আগেই আমরা, অফিসে যাই চলে।
দেরি হলেই অনেক স্যারে, অনেক কথা বলে।
মনের ভিতর কোন কষ্ট, পুষে নাহি রাখি।
কাজের সময় কাজ করি মোরা, দেইনা কভু ফাঁকি।
অনিয়মের ধার ধারিনা, সঠিক পথে চলি।
শত কষ্টের মাঝে মোরা, সত্য কথা বলি।
মিলে মিশে থাকি সবাই, ফ্যাসাদ নাহি করি।
হালকা পাতলা কাজ যে মোদের, নয় কোন কাজ ভারী।
ব্যাবিলনের নিয়ম নীতি, আমরা সবাই মানি।
মনের কষ্ট ঘুচলো মোদের, মুছলো চোখের পানি।
মনের ভিতর আছে মোদের, অনেক অনেক আশা।
পূর্ণ হবেই ব্যাবিলনের প্রতি, থাকলে ভালোবাসা।

বংশীভিটার ভুঁই

মাহমুদ আলম সিদ্দিকি
ডেপুটি ম্যানেজার, এইচআরডি এন্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

আফাজুদ্দিনের গ্রামখানি শ্রাবণ থেকে অঘ্রাণ মাস পর্যন্ত সবুজ দ্বীপের মতো আবদ্ধ থাকে বর্ষার জলে। শুধু গ্রাম নয়, গ্রামের বাড়ীগুলোও এক একটা ছোট্ট দ্বীপের মতো রূপবতী হয়ে উঠে তখন। গুনে গুনে এরকম ১৮টি বাড়িদ্বীপ আর ৪টি মোহনীয় ভিটার অবিরল বুনো সৌন্দর্য নিয়ে শোলাহাটি গ্রামখানি উৎসবে জেগে থাকে বর্ষায়।

এরকম এক বর্ষার দিনে গাঁয়ের দক্ষিনের বিশাল মাঠের প্রান্তরেখা থেকে সাদা পালের গায়ে হওয়া লাগিয়ে হেলেদুলে একখানা দানব আকৃতির পানসি নৌকা এসে ভেড়ে আফাজুদ্দিনের ঘাটে। দেখতে দৈত্যের মতো হলেও লাল নীল হলুদ সবুজ কাগজের পাতাকায়, রঙিন মালায় এবং পিতলের অলংকারে সাজানো নৌকাটা যখন আফাজের বিয়ের বরযাত্রী আর তিন গ্রাম পরের ধনেখালী থেকে ছাপ্পানো টাকা দেনমোহরের বিনিময়ে বিয়ে করে আনা মহুয়াকে নিয়ে ঘাটে ভেড়ে তখন মধ্য হেমন্তের শেষ বিকেলের মোহন আলোতে নৌকার গলুইয়ে, ছইয়ের উপর নৃত্যরত বয়যাত্রীদল এবং বধূবরণের জন্য সমবেত উল্লাসে ফেটে পড়া গ্রামবাসীদেরকে জলের উপরের সবুজ ধানের ক্ষেতের উপর নাচতে থাকা রোদ আর ফড়িঙের মতো উদ্ভাসিত মনে হয়। গ্রামের যারা হিন্দু তারাও প্রিয় আফাজের বধূর আগমনে মঙ্গল দীপ জ্বালে; উলুধ্বনি দেয়। শুধু সবার অলক্ষ্যে এক আসমান ব্যথা বুকে নিয়ে ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠে ও পাড়ার লীলাবতি তার ঠাকুমার বুকের মধ্যে মাথা পুরে দিয়ে।

কোন এক পূর্ণিমা তিথির চৈত্র রাতে স্কুল মাঠের পাশের হিজল গাছের তলায় বসে মুরলি বাঁশির মোহন সুরে আফাজ যেদিন প্রান্তর ভাসিয়ে দিয়েছিলো, তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি লীলাবতিকেও সে রাতে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অনিন্দ্য প্রেমলোকে। তারপর অনেক চৈত্রে, অনেক ফাল্গুনের তারা ভরা রাত কিংবা ভরা বর্ষার টইটম্বুর ঢল ঢল প্রান্তর আফাজের বাঁশির সুরে লীলাবতিকে নিয়ে ভেসে গেছে বহুবার। লীলাবতির মতোই আরেকজন কেঁদেছিলো সেই কার্তিকের বিকেলে। ঢাউস আকারের পানসিখানা যখন উল্লসিত বরযাত্রীদের নিয়ে ঘাটের খুব কাছে চলে আসে তখন কি এক অনির্বচনীয় আনন্দে আফাজের মায়ের চোখে জল ছাপিয়ে যায়, আর তখনই আফাজের মৃত বাপের কথা মনে আসে তার। সেই আনন্দের সাথে একরাশ ভয়াল আফসোস আর হাহাকার মিলেমিশে তার মুখের উপর সুখ আর দুঃখের যে দ্বি-মাত্রিক পটভূমি ব্যক্ত হয়ে উঠে তা বধূবরণের পূর্ব মুহূর্তটাকে মহিমান্বিত করে তোলে।

আফাজের বাবা ছিলেন আলফাজুদ্দিন। উত্তরাধিকারে পাওয়া ২৫ বিঘা জমিতে বছরের পর বছর ধরে সোনা ফলিয়ে আর টুকটাক ব্যবসা করে অনেক স্বচ্ছল মানুষ হয়ে উঠেন আলফাজুদ্দিন। কিন্তু গ্রামের দলাদলি, মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে শেষমেষ আট বিঘা জমি আফাজুদ্দিনের জন্য সম্বল রেখে কোন এক শেষ রাতের নিদ্রার মধ্যে চিরনিদ্রার দেশে চলে যান আলফাজুদ্দিন। আফাজ তখন ১৪ বছরের কিশোর। জীবন ও জগতকে ভালোভাবে চিনতে পারার আগেই বাবার এই অকালপ্রয়াণ আফাজের জীবনের অভ্যস্ত ছন্দের উপর আকস্মিক কষাঘাত করে। কিন্তু রেখে যাওয়া আট বিঘা জমি, ১৪ বছরের আফাজ, নিজের সাহস-সততা এবং পরিশীলিত ঔদ্ধত্য নিয়ে আফাজের মা নতুন জীবনের রাশ যেভাবে টেনে ধরেন,

তাতে আফাজের জীবনের পুরনো ছন্দ আবার ফিরে আসে অল্প দিনের মধ্যেই । শুধু মাঝে মধ্যে তার বাবার স্মৃতি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অসীম শূন্যতায় । তবে আশার কথা হলো তার মায়ের অনিঃশেষ স্নেহ আর বিয়ের পর দুর গাঁয়ের সেই মহুয়া বউ আফাজের আপন সত্ত্বাকে এতো বেশি দখল করে ফেলেছে, যে খুব বেশিক্ষণ সে শূন্যতায় ভাসার সুযোগ পায়না আফাজুদ্দিন ।

বাবার রেখে যাওয়া বিঘা দেড়েক বসতভিটা, একটা মস্ত পুকুর, পুকুরের পাড় ঘেষে বিঘা দুই পরিমাণ গাছপালা, বাঁশ বাগানের ঠাস বুননের একটা বড়সড় ভিটা-শোনা যায়-সন্ধ্যাবেলায় এ ভিটার কদম গাছের ডালে বসে জিন পরীরা বাঁশী বাজাতো বলে এর নাম হয়েছে বংশীভিটা, ভিটার পাশ ঘেষেই একদাগে সাড়ে তিন বিঘা ধানী জমি, লোকে বলে বংশীভিটার ভুঁই এবং আরও দুই-তিন খন্ড ছোটখাটো জমিতে বাবার মতোই সোনা ফলিয়ে বেশ শান্তিতে কাটতে থাকে আফাজের সংসার জীবন।

হেমন্তের রাতের বাতাস যখন ধীরে ধীরে হিমেল হয়ে আসতে থাকে তখন দক্ষিণের জলমগ্ন পাথারে পাকতে শুরু করা আদিগন্ত আমন ধানের হলুদ ক্ষেতের উপরে নরম জ্যোৎস্নার প্লাবন বয়ে যায় । ননীর মতো গলে গলে পড়া সেই মায়াবী জ্যোৎস্নায় জলের মধ্যে ফুটে থাকা অসংখ্য অজস্র শাপলা ফুলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় আফাজ বলে- 'জানিস বউ, তরে ঐ শাপলা ফুলের চাইতেও সুন্দর লাগে ।' আহ্লাদে গদগদ মহুয়া আফাজের চুলের মধ্যে বিলি কাটতে কাটতে গুনগুন করে গান গায় । মিহি গলার সুরেলা গীতের অনুরণন আফাজকে তন্ময় করে তোলে । গাঁয়ের পূর্ব পাশ দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে সাপের মতো বয়ে চলা মালিন্দী নদীর কোন এক নৌকা থেকে দরদী গলার প্রলম্বিত মেঠো সুর একটু একটু করে মিলিয়ে যাবার আগেই চাঁদের আলোর নীচে আফাজ আর মহুয়া ঘুমিয়ে পড়ে ।

বংশীভিটার পাড়ের একটু নীচে বর্ষায় গলা ডুবিয়ে থাকা সারি সারি হিজল গাছগুলোর শরীর থেকে কমতে থাকা জল যখন গুড়ির নীচে চলে আসে তখন শীত নামে শোলাহাটি গ্রামে । অবশেষে শুকিয়ে যাওয়া জমির মধ্য দিয়ে নরম মাটির অসংখ্য সাদা সাদা পথ তৈরী হয় । সেই পথ ধরে হলুদ সরষে ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে আফাজ যখন ভূঁইয়া বাড়ীর নাটমন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে সন্ধ্যার একটু পরে, মহুয়া তখন অবলীলায় তার সঙ্গী হয় । নাটমন্দিরের কীর্তনের আসরে আফাজ যখন ঘুরে ঘুরে বাঁশি বাজায়, মহুয়ার অন্তরের ভিতরে তখন রাধার মতো তোলপাড় শুরু হয় । তারপর মধ্যরাতের মেঠো পথের ভেজা ঘাসে পা ভিজিয়ে বাড়ি ফেরে দু'জন ।

এভাবেই অতিক্রান্ত বহুকালের সাথে সাথে গ্রামের মালিন্দী নদীটির দুই পাশ সংকুচিত হয় । তার তলায় কালের পলিমাটি জমা হতে হতে হাঁটুজলের গভীরতা লাভ করে । বিশাল পাথারে পাথারে গড়ে উঠে মানুষের গাদাগাদি বসতভিটা । গাঁয়ের নদী-প্রকৃতি-আচার-সংস্কৃতির চিরায়ত ছন্দ দ্রুতলয় লাভ করে । গ্রামের শেষ প্রান্তে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে যাওয়া মহাসড়কের দুই পাশ ঘেষে অসংখ্য সাদা-কালো সাইনবোর্ডে "এই জমির মালিক" এর নাম লিপিবদ্ধ হয় । ন্যাশনাল, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলোর দালালেরা আফাজুদ্দিনের মতো সোনা ফলানো মানুষদের সোনার মাটি কিনে নেবার জন্য তাবৎ ফন্দিফিকির করে একসময় কুপোকাৎ করে ফেলে । সীমাহীন লোভের হাতছানি উপেক্ষা করে শুধুমাত্র আফাজুদ্দিন অনড়, অবিচল থাকে।

আফাজুদ্দিনের বংশীভিটার ঠিক পাশ ঘেষেই একসময় মালিন্দী নদীর ড্রেজার থেকে মোটা মোটা পাইপের ভিতর দিয়ে দিনের পর দিন বালি ভরাট হতে থাকে । তারপর একদিন লাল ইটের দেয়ালের উপর নীল রংয়ের বাহারী চালা দিয়ে সুদৃশ্য স্থাপনা তৈরি হয় । কোন একদিন সূর্যোদয়ের একটু পরেই বিশাল হুইসেল বাজিয়ে কারখানার শুভসূচনা হয় । দুপুরে এবং বিকেলে ছুটির সময় আবার হুইসেল বেজে উঠে । পিঁপড়ার সারির মতো মানুষেরা সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায় একবার ভেতরে ঢোকে আবার বাইরে বের হয়ে আসে ।

চৈত্রের পড়ন্ত বিকেলে আফাজুদ্দিন বংশীভিটার আম গাছের নিচে বসে শরীর জুড়ায়। সামনের ক্ষেতে ক্ষেতে ব্যস্ত হয়ে থাকা গমের পাকা রঙে মাঠটাকে ধুসর দেখায়। গম ক্ষেতের ভিতর দিয়ে দুধ সাদা আইল ধরে হেঁটে এসে সুরুজ মিয়া এক সময় আফাজের পাশে গিয়ে বসে। কিছুক্ষণ মৌন বসে থেকে আফাজের মেজাজ পড়ার চেষ্টা করে সুরুজ মিয়া। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'কেমন আছো চাচা?' আফাজ কোন উত্তর না দিয়ে পশ্চিমের গম ক্ষেতের দিকে নির্বিকার তাকিয়ে থাকে। তোমারে কত কইরা কইলাম জমিটা আমারে দ্যাও, তুমি কোন কথাই শুনলা না। মালিকের লগে আমি কথা কইছি, তোমারে আরো বাড়াইয়া দিবানে। অহনো সময় আছে, পরে কিন্তু পস্তাইবা। তোমার ছেলেডাওতো বড় পাশ দিছে এ বছর। তুমি চাইলে মালিকরে কইয়া একটা ভালো চাকরির ব্যবস্থা কইরা দিবানে। বাড়িত থাইকা চাকরি করবো...। আফাজের অপলক দৃষ্টি ধুসর গমের ক্ষেত থেকে আরও একটু উঁচুতে উঠে দিক চক্রবালের তেজি সূর্যের উপর নিবদ্ধ হয়। তারপর সেই রক্তবর্ণ চোখ দুটো মুহূর্তে দিক পাল্টিয়ে সুরুজ মিয়ার চোখের উপর ক্রোধের আগুন ফেলতে থাকে। সে আগুনের তেজ সইতে না পেরে সুরুজ মিয়া একটু আগে যে পথ ধরে উদয় হয়েছিলো, সেই একই পথ ধরে দ্রুতবেগে বিড়বিড় করে এক সময় গম ক্ষেতের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

চৈত্র শেষে বৈশাখ এবং জৈষ্ঠের প্রখর খরতাপের পর আষাঢ় ফিরে আসে শোলাহাটি গ্রামে। বংশীভিটার জমিতে নধর সবুজ ধানের উপর ঘাস ফড়িংয়েরা খেলা করে। এ সবুজ আরো গাঢ় হবার আগেই কারখানা থেকে নির্গত লাল-নীল-সবুজ-কমলা রঙের বহু বর্ণিল পানির স্রোত আফাজের জমির পূর্ব দিকের ঢালু দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে পুড়িয়ে দিতে থাকে তার সবুজ স্বপ্নগুলোকে। মান্যগণ্য বহুজনের কাছে নালিশ জানিয়ে কোন সুরাহা না পেয়ে শেষে পূর্ব থেকে পশ্চিমের দিকে একটা আড়াআড়ি বাধ দিয়ে লাল-নীল পানির প্রবাহ খালের দিকে ঘুরিয়ে দেয় সে। উন্নয়নের রঙিন জলে প্রথমে খাল তারপর মালিন্দী নদী এবং একে একে শোলাহাটির পুকুরগুলো নীল বিষে আক্রান্ত হতে থাকে।

আষাঢ়ের এক গুমোট বিকেলে উত্তর-পশ্চিমের আকাশ কালো হয়ে মেঘ জমতে থাকে। ধুসর কালো সেই আশ্চর্য মেঘদল আসমান আর জমিনের ব্যবধান একাকার করে দিয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে তার লকলকে আগুনের জিভ দেখিয়ে প্রলয় তান্ডবের হুংকার দিতে থাকে। পাগলা বাতাসের তোড়ে দিক্‌ভ্রান্ত মিশকালো মেঘেরা যখন উথাল পাথাল হয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলে শোলাহাটির আকাশ-বাতাস-বন-প্রান্তর, বংশীভিটার তাল-নারকেল-কদম বনের দোলায়মান অস্থির সবুজের মধ্যে আরো বেশি অন্ধকার নেমে আসে তখন। ছাইকালো মেঘেদের পর্দার উপর দিয়ে বেসামাল ধবল বকেরা দিগ্বিদিক উড়াউড়ি করতে থাকে শোলাহাটির উদ্‌ভ্রান্ত আকাশ জুড়ে।

এই দুর্যোগের গনগনে তান্ডবের মধ্যে আফাজ বেরিয়ে পড়ে তার আবাল্য অস্তিত্বে মিশে থাকা বংশীভিটার জমিখানির শেষ পরিণতি দেখার জন্য। বৃষ্টি-বাতাস-বজ্রপাতের ভয়ংকর বিকেলে ক্ষেতের পাশের চিরবন্ধু জামগাছটাকে জড়িয়ে ধরে বংশীভিটার জমিতে দোলায়িত সবুজ ধানের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে আফাজুদ্দিন। আকাশচেরা বৃষ্টির জলের প্লাবন লাল-নীল রংয়ের বিষাক্ত তরল শরীর নিয়ে উঠে আসতে শুরু করে ক্ষেতের দিকে। আফাজের মনে পড়ে, তার বাবা মৃত্যুর সময় বলেছিল- 'বংশীভিটার এই জমিটাকে কখনো হাত ছাড়া করিস না বাবা।' ঠিক তখনি একটা প্রচন্ড আলোর ঝলকানি আফাজের আকড়ে ধরা জামগাছটিকে ঝলসে দিয়ে পুরো শোলাহাটি গ্রামটাকে মুহূর্তের মধ্যে আলোকিত করে দেয়। আফাজের মাটির শরীরের ভিতর দিয়ে সেই আলোর প্রবাহ পৌঁছে যায় পৃথিবীর মৃত্তিকার গভীরে।

Asia Cup Cricket - 2012..... Some of My Thoughts

Mohammad Hasan
General Manager
Babylon Group

On that day Mirpur Sher-E-Bangla stadium was full of extra players who were on a countdown to another announcement of victory for us after 41 years. Thursday, 15 March 2012, Bangladesh cricket team was poised to be declared Asia Cup champion for the first time in the history. As opposition was Pakistan excitement was high, almost reaching the sky. Since Bangladesh cricket team won the previous two matches it was now almost confirmed that they were going to do it again today. The whole nation was preparing for a big celebration. We were on the verse of achieving another victory in the month of our independence.

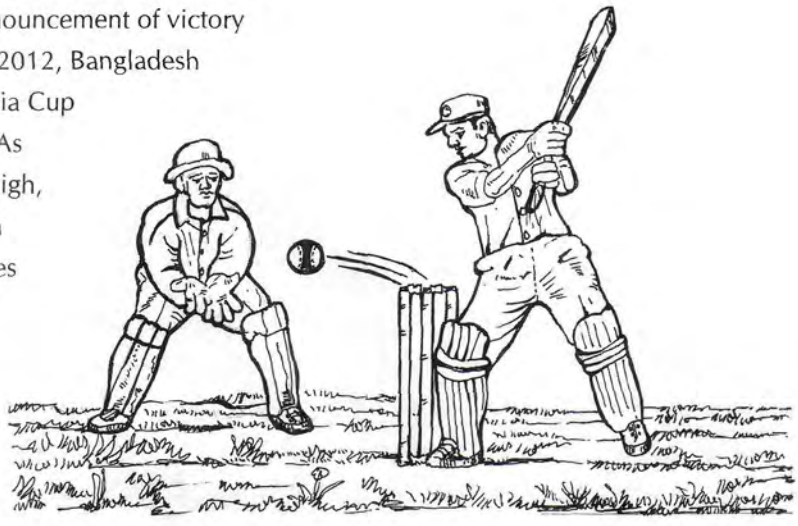

Both our bowling and fielding sides did very well, if we did not want to count the last over where Bangladesh conceded 19 runs.

As batting side also had been doing their best with a few exceptions, expectation was so high. After the fall of the wicket of our Shakib-Al- Hasan I left the virtual stadium and rang one of my friends. He was so disturbed to receive my call and picked up the phone only at the last ring. I told him the reason of my call. In return he assured me that Bangladesh team would win so I did not need to worry. He scolded me that Bangladesh team did not need a supporter like me who would leave the team at their bad time. I felt embarrassed as he questioned my loyalty to Bangladesh team. I replied to him, "Actually I could hardly bear the scene of my team losing". I knew from my experience that my friend was almost always correct in his predictions. So I got back to my seat again. Everybody was tensed. All the eyes were on the TV screen. Even our buas (maids) were not unhappy to sacrifice their regular Hindi serials on that evening. Rather they too were cursing the Pakistani fielders when they were stopping our boundaries.

It was in the year 1999, first time Bangladesh Cricket team was in world cup mission. In one of the group matches Bangladesh faced Pakistan. It was an office day - I started recalling my memories. We were listening to radio at our office in Dhanmondi. We did not have any TV those days in our rented and congested office space. Everybody was excited about what would happen? What happened was that our young tigers defeated Pakistan. We then experienced the joy of independence, who had missed the moments of victory in 1971.

We, including our directors, brought out a procession to express our joy, praising our team, wishing good luck for the country. One of our senior colleagues led the procession with various slogans. We all followed and

echoed him. All on a sudden he stopped and started looking for something he lost. We were all at a loss. Finally we came to know that he had lost his false tooth. We all started going back the path we had passed looking for it. Thanks God finally one of our colleagues found it intact and handed it over to him. He rubbed the tooth with handkerchief and put it back to his gum where it belonged. The smile we saw on his face is never erasable from our mind. Again our procession got its way forward. Next day we had a feast to celebrate the victory. The culture is still with us in our beloved organization.

Suddenly a big 'eshshsss.....' brought me back from my sweet memories, another wicket of Bangladesh team had fallen without any run. Our buas prepared all the ingredients for a delicious meal to be cooked. The chief chef was busy with the big sport and was commenting like Sunil Gavasker, Imran Khan etc. My inclination to this very game was not very old. To me it was a game for wealthy, healthy and relaxed people. For them just to kill time. The chief chef used to claim that I had learnt the game - googly, reverse swing, on-side, off-side, spin, LBW all the jargons from her. I agreed that she was my first cook to give me the taste of cricket.

My brother-in-law, once a local cricketer, and his friends were invited to celebrate the victory, which was the expectation.

Two runs to win, blood pressure was high. What would happen next- happiness or sadness, joy or cry, have a big party or have no food at all? Last wicket fell before the last ball. I left the room again ..... Pin-drop silence ..... Everyone got out of the room ..... no talking to each other. Needless to say we ..... the game. No dinner, no talk, everyone retired to bed.

Friday morning daily newspapers headlined in their prime spots with a headline "too close too far" etc. along with photos of tears of our star cricketer Shakib Al Hasan. I did not read the details as I had watched the game.

Throughout the whole day I had been thinking minutely what had happened last evening. What we had lost, what we had gained. We lost a prize, recognition but we gained a lot too- experiences that cemented the foundation stones for many victories to come. To see the glass half full instead of half empty is a shift of mental shape. I solaced my dejection with a feeling that our team did not do very badly. They tried and had earned our best wishes. Individually Tamim Iqbal earned 4 consecutive 50s which he celebrated showing his fingers 1-2-3-4. Shakib Al Hasan regained his status of world number one all-rounder but as a team we lost. It was a team game. Team performance was the matter to win the competition.

The same picture we find in the business organizations also. Big successes of individuals collectively can be much less than a small success of the whole team. How good some leader actually is reflects in how nicely he/she manages his/her team. We should build a team, be in the team and win as a team.

Born To Live For Ever

Salma Sultana
Officer Admin
Babylon Group

In the late afternoon while returning home from a work, she caught a sudden glimpse of him cycling in the busy street. She felt a pang of panic and unconsciously held the hand of her husband sitting beside her in the rickshaw. She just pointed him at the boy whom they had already passed. None of them dared to call him as that might send him off-balance.

It was their son, their only child Abeer at his eighth.

His face was radiant at the joy of adventure and freedom. The thought of *"My parents would never know about my secret"* added thrill to the fun. As soon as he found his parents had left home, he borrowed the cycle from an elder friend of his neighborhood and pedaled it to his heart's content. He was never so happy before. He thought it would be the memorable day in his life. He had no idea how correct he was but in a very different way!

Just before evening he handed over the precious possession to its rightful owner and headed for home. When he was a yard or two from the gate, he suddenly stopped. He could see the lights on in his parents' room. They were home already! Panic seized him. He became numb of fright. He knew his father. What would he tell him about his coming home so late? Also he did not have the courage to face another confrontation with his mother.

Intensely scared he was, yet somewhere inside his mind he had the hope that mother was there to save him from the rage of his father. She wouldn't let him receive any punishment. But how wrong he was!

With shaky steps he entered the house and instantly felt the tension in the air. In a thundering voice father called out, 'Abeeeeer!' the moment he saw him. Blood drained from his face. He could not remember what his father had told. He just remembered that he was crying and calling for his mother in a hoarse voice. To his shock and utter surprise she didn't come to rescue him nor appeared near the zone.

Abeer had no way to know that that time she was busy fighting with her tears trying not to hear his scream.

He used to sleep with his grandma. Later in that night the repentant father could not gather himself to do it but the mother did go to see the sleeping son. She hugged him close and felt his body racked with sobs. They didn't remember how long both of them had cried bitterly and at last he slept holding his mother tightly. But the poor, remorseful father could neither express his emotion nor could sleep a wink.

Abeer was growing with love and care from his parents and also he was receiving endless affection from all the other people around him. He was such a loveable boy! He had an attractive feature with fair complexion, a pair of intelligent eyes and a constant smile on his face. He was just a cupid.

And what would I tell about his friends! No one knew how many friends he exactly had. The boys at his age, younger or older, all were his friends. When he was in standard five or six, he had friendship with the bhaiya's of even standard nine or ten.

Once his mother fell sick and she was taken to a clinic in a critical condition. Even at that moment her eyes scanned everywhere for Abeer and in her faint voice she kept calling him.

He was in standard seven or eight when he got a baby sister. His joys knew no bounds at the existence of that pixy. Whenever he had free time after his study and game he was always there beside the sister.

He was a bookworm. He had lots of books (most of them were tin goyenda serials), which were later to be inherited by his sister Sabah. He was good at sports as well. He played cricket with the local teams and also with his school team at Chittagong Collegiate School. Soon he became the proud possessor of a number of medals and shields, which still are found decorating their house.

At the age of three little sister Sabah got severely sick. The doctors diagnosed kidney difficulties. The family was in terrible mental crisis at that time. The parents flew to Madras, India with the sick child, leaving Abeer with his grandma and one of his favourite cousins Nilu Aapu.

There was no need to worry about Abeer. He was such a fit boy!

The parents and the daughter came back from India relieved. The doctors there had found nothing serious in her except for a urine infection.

Abeer passed his S.S.C and H.S.C finals with brilliant results and got himself admitted to Marketing Department of Chittagong University to study BBA.

He was a grown up boy by now. Then it was the father's turn. This time all four of the family went to Vellore, India to have eye operation of father. There they thought about Abeer's tonsils as well. He had occasional problems with them. But he objected and refused to do the operation there as he thought it was still not so serious or painful. Also he said if he had to do it, he would prefer to have the operation done in Bangladesh by his uncle, father of one of his friends.

Abeer was a young man of twenty-two. He turned into a very charming, humorous and handsome young man, very famous and popular in the campus. Yet he still was a baby inside, always clung to his mother, fighting with the little sister, singing with his hoarse voice and with full of life.

It was the evening of 24th June. Abeer telephoned his uncle's house and his cousin Lipi Aapu received the phone. Abeer had a piece of light conversation with her and wanted her to pass the line to her father. He requested his uncle to pray for him as the next evening he would have his tonsil operation by his friend's father, a famous ENT specialist. Lipi Aapu overheard the conversation and got angry. She took the phone and charged him with- Why didn't you tell me about your operation? Mockingly he answered- *You are by no means fit for sharing with something serious. You are to share with the news of any new ride in the children's park or any new animal in the zoo.* Saying this he burst into laughter and the furious Aapu slammed the receiver down.

He made numerous phone calls informing people about his operation and reminding them to pray for him. But to the friends he added something more in his reminder. It was like- *Don't forget to bring ice cream for me. Each of you should wait outside the OT with the ice cream for me.* And they really did as he had said but.....

He even made call to the wife of the doctor, his aunt- *Hey aunty let uncle sleep early this night and don't fight with him today anymore. 'Cause tomorrow is my operation and my life is in his hands.*

And he called his friend, the doctor's son - *I've filed a GD in Panchlaish Thana (the area where the doctor lived). Be careful, if something bad happens to me, you all will be the jail dove, ha ha ha.* Ironically, all he had prophesied out of fun came as a cruel truth later.

In the morning of 25th June, the day of his operation, the mother was reading newspaper. Abeer came from nowhere, gave a sudden bite on the mother's hand and ran with her newspaper. Today she cannot read the newspaper anymore. The paper reminds her the scene - *He bit on the hand and ran away grabbing the paper from her.*

He always kept the house alive. Even his very moody father who believed in *Making or participating in fun was forbidden for the head teachers* - was not saved from his funny attacks. Quite often a secret line of smile would find on the corner of his lips whenever Abeer was around. He had to struggle hard to suppress them.

In the evening Abeer went to the clinic in the same humorous mood. When the nurses came with a stretcher to take him to the OT, he just dismissed the idea by waving his hands and entered into the OT in long, steady steps. In the last few moment just before the door closed behind him - was he a bit nervous?

The parents and the friends were waiting outside. The friends were in a cheering mood. It was like a reunion to them. None of them was even slightly worried as it was a very minor operation and would take no more than half an hour. They busied themselves in chatting.

Suddenly they had a feeling that something was not right, something was wrong, very wrong. The OT remained closed for a longer time than usual. The door was not opening, it was not opening and it was not opening at all. When they were at the edge of their patience, the door opened and the doctor came out with a gloomy face. The parents rushed inside.

Abeer was lying still on bed; still he had life in him but there were large swabs of cotton soaked in blood piled in the corners of his cabin. Something had happened to him, something terrible. The panicked mom ran from here and there frantically for the doctor. But for some unexplained reasons the doctor was avoiding to face her.

There had been a mistake in the apparently minor surgery. Of course nothing was done intentionally from the part of the doctor. On the contrary he was paying extra attention as the patient was like his own son. Was it that his over cautiousness had made him nervous during the simple surgery? The answer to this remains unknown till today.

But something was clear as day light that in a little while the whole sky had fallen on the family. After some hours the doctor finally returned to the patient, injected some medicine into his vain and in a few seconds before the eyes of his parents and the people he loved, all the movements in Abeer's body stopped forever. The cheering friends who were waiting for him threw the ice creams and broke the door and window of his cabin out of rage. But nothing in the world had worked to bring Abeer back to life.

It was the end, end of a wonderful life. He was on a journey to an unknown world; leaving all his beloved ones behind carrying all the charm of the family with him.

He must be now resting in peace in a snug place for eternity. We don't know where exactly Abeer is now. But who says that we don't know? We must know that he is living in us, amongst us.

ব্যাবিলন গ্রুপের বিভিন্ন কর্মকান্ডের ছবি
(A few snapshots of Babylon Group)

A rally on the eve of Babylon Blood Donation Camp.

A scene from documentary on Softy 'Softy Amar Shasthya Amar'.

Babylon artists are participating in a fashion show in the annual picnic at BCWL.

Babylon built the house for the family of a former Babylon employee who died of cancer.

Babylon Directors are laying foundation stone of Babylon Agriscience Park.

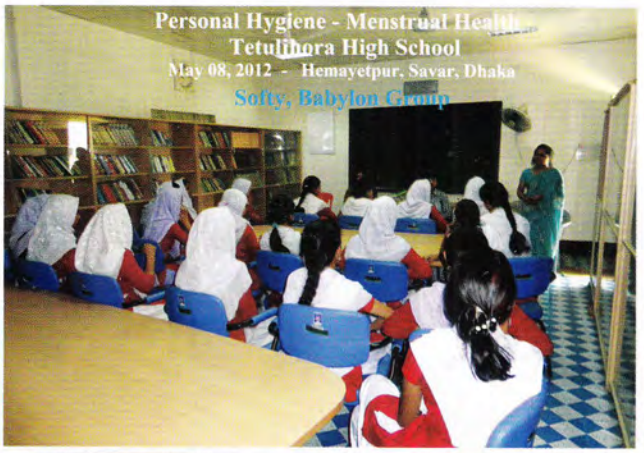

Babylon organized orientation programme on menstrual hygiene at Tetuljhora High School.

ব্যাবিলন গ্রুপের বিভিন্ন কর্মকান্ডের ছবি

(A few snapshots of Babylon Group)

Babylon team is distributing warm clothes to the cold affected people of North Bengal.

Emeritus professor Anisuzzaman of Dhaka University is unwrapping the 6th edition of Babylon Kathokatha along with Babylon Directors.

Members of a Chinese business delegation team are visiting Babylon.

Ms. Ella de Voogd, First secretary, SRHR, Education and Gender, Embassy of the Kingdom of the Netherlands is witnessing how Softy is being made.

Paediatrician Prof. Dr. M O K Wahedi is examining a patient at the health camp organized by BMS.

A glimpse from fashion show at AKWL on the day of annual picnic.

BABYLON

Babylon Medical Services (BMS)

(Established - 2007)

Services:

a. Outdoor Service
b. Executive Health Check Up
c. Specialist Service
d. Health Package for Factory
e. Pathological Service
f. Day-care Service (Sick Bed)
g. Minor Operations
h. EPI Program for Child and Mother
i. Fair Priced Pharmacy
j. Free Health Camps at Schools and Villages
k. Yearly Blood Donation Program

12 hour service (9:00am- 9:00pm)

Location: Plot - 242-243, Union - Tetuljhora, Hemayetpur, Savar, Dhaka.

BABYLON **Agriscience Ltd.**

Babylon Group: 2-B/1 Darussalam Road, Mirpur-1, Dhaka-1216, Bangladesh
Phone: 88-02-8023495-6, 8023462-3, WWW. babylongroup.com

ব্যাবিলন গ্রুপের প্রতিষ্ঠানসমূহ:

- ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ
- ব্যাবিলন ড্রেসেস লিঃ
- সুরভী গার্মেন্টস লিঃ
- অবনী ফ্যাশন্স্ লিঃ
- অবনী টেক্সটাইলস লিঃ
- অবনী নীট ওয়্যার লিঃ
- জুনিপার এমব্রয়ডারীজ লিঃ
- ব্যাবিলন ট্রিমস লিঃ
- ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিঃ
- ব্যাবিলন ওয়াশিং লিঃ
- ব্যাবিলন বায়িং সার্ভিসেস লিঃ
- ব্যাবিলন আউটফিট লিঃ
- ট্রেন্ডজ
- ব্যাবিলন প্রিন্টার্স লিঃ
- ব্যাবিলন মেডিক্যাল সার্ভিসেস
- ব্যাবিলন লজিস্টিক্স লিঃ
- ব্যাবিলন এগ্রিসায়েন্স লিঃ

Head Office:

2-B/1 Darus Salam Road, Mirpur
Dhaka-1216, Bangladesh.
Tel : 8023495-6, 8023462-3 (Off)
9007175, 9010533, 8011089 (Fac)
Fax : 880-2-8032949
E-mail : babylon@babylon-bd.com
Web : www.babylongroup.com